sneses of "know"), জ্ঞানের উৎস সম্পর্কীয় মতবাদ (Theories of origin of knowledge) : বুদ্ধিবাদ (Rationalism), অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism), কান্টের বিচারবাদ (Kant's Critical Theory)।

চতুর্থ অধ্যায় : নীতিবিদ্যা (Ethics) ১৫৫-২১১

- নীতিবিদ্যার স্বরূপ ও পরিধি (Nature and scope of ethics), নীতিবিদ্যার শাখাসমূহ (Branches of ethics) আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা (Normative ethics), অধি নীতিবিদ্যা (Meta-ethics), ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা (Applied ethics)
- নৈতিক ও অনৈতিক ক্রিয়া (Moral and nonmoral actions), ভালো ও মন্দের ধারণা (Concepts of good and bad), যথোচিত ও অনুচিত (Right and wrong), কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতা (Duty and obligation), অধিকার ও কর্তব্য (Right and Duty), কর্তব্য ও সততা (Duty and Virtue)
- নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু (Object of Moral Judgement)—উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় (Motive and Intention)।

নমুনা প্রশ্ন

- প্রথম অধ্যায় ২১২-২১৮
- দ্বিতীয় অধ্যায় ২১৮-২২৪
- তৃতীয় অধ্যায় ২২৫-২৩১
- চতুর্থ অধ্যায় ২৩১-২৩৮

পরিভাষা কোষ ২৩৯-২৪৪

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা (Introduction)

একদিন মানুষ তার পশ্চাতের শিকারী জীবন অতিবাহিত করে যেমন শিখেছে পশুপালন, ধাতুর ব্যবহার, কৃষিকর্ম,, আগুনের ব্যবহার তেমনি কালের ক্রমপরিবর্তনে শিখেছে কাম্য বস্তু লাভ করার জন্য, সুষ্ঠভাবে জীবনশৈলী পরিচালনার জন্য, জীবনে নানা জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের বিচার বিশ্লেষণাত্মক এক পদ্ধতি। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই বিচারমূলক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বা দার্শনিক পদ্ধতি। অ্যারিস্টটলের মতানুসারে, মানুষ হল বুদ্ধিদীপ্ত জীব। চিন্তা মানুষের স্বভাবগত ধর্ম। যা হতে বিচার প্রবণতার প্রয়াস স্বাভাবিক। যা আদি পাশ্চাত্য দর্শনের জনক থেলিসের জীবনে বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক আলোচনার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দর্শনের উৎস নিয়ে দার্শনিকদের মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। যেমন প্লেটো বলেছেন "বিস্ময় থেকে দর্শনের উৎপত্তি।" আবার দেকার্ত বলেছেন "সংশয় থেকে দর্শনের উৎপত্তি।" অনুরূপভাবে জগতের মৌল উপাদান সম্পর্কেও দার্শনিকদের মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন থেলিস জলকে বলেছেন জগতের মূল উপাদান। আবার অ্যানাক্সিমিনিস বায়ুকে বলেছেন জগতের মূল উপাদান। একইরকমভাবে দর্শনের সংজ্ঞা নিয়েও দার্শনিকদের মধ্যে মতের অন্ত নেই। নিম্নে কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল—

১। OXFORD DICTIONARY OF PHILOSOPHY গ্রন্থে দর্শনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে— "The study of the most general and abstract features of the world and categories with which we think : mind, matter, reason. Proof, truth etc."[১] অর্থাৎ দর্শন হচ্ছে জগতের সাধারণ ও পরম অবয়ব সম্পর্কিত জ্ঞান এবং বোধের আকার সমূহের অধ্যয়ন। মন, বস্তু, যুক্তি, প্রমাণ, সত্য প্রভৃতি বিষয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত।

২। ভুন্ড (wund) এর মতে, "Philosophy is the universal science which has to unite he leognitions attained by the particular science into a consistent system."[২] অর্থাৎ দর্শন হল সার্বজনীন বিজ্ঞান যা বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানকে সংগতিপূর্ণভাবে প্রণালীবদ্ধ করে।

৩। প্লেটোর (plato) মতে, "Philosophy aims at the knowledge of

the eternal, of the essential nature of things."[৩] অর্থাৎ দর্শন আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার জ্ঞান দান করে। যা নিত্য ও শাশ্বত তার এবং বস্তুর মূল স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা দর্শনের লক্ষ্য।

৪। অ্যারিস্টটল (Aristotle) এর মতে, "Philosophy is the science which investigates the nature of being as it is in itself and the attributes, which belong to it in virtue of its own nature." [৪] অর্থাৎ দর্শন হল এমন একটি বিজ্ঞান যা সত্তার স্বরূপ ও সেই স্বরূপের অঙ্গীভূত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসন্ধান ও আলোচনা করে।

৫। কান্ট (kant)-এর মতে, "Philosophy is the science and criticism of cognition."[৫] অর্থাৎ দর্শন হল জ্ঞানসম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও সমালোচনা।

৬। হেগেল (Hegel)-এর মতে, "Philosophy is the science of absolute idea."[৬] অর্থাৎ দর্শন হল পরম ধীশক্তি বা পরম চিন্তনের বিজ্ঞান।

৭। ওয়েবার (weber)-এর মতে, "Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of things."[৭] অর্থাৎ দর্শন হল প্রকৃতির সম্পর্কে সামগ্রিক মতামতের সন্ধান। বস্তুসমূহের সার্বিক ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস।

৮। হার্বার্ট স্পেন্সার, (Herbert Spencer)-এর মতে, "Philosophy is the completely unified knowledge generalisation in philosophy comprehending and consolidating the widest generalisations of sciences."[৮] অর্থাৎ বিভিন্ন জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ সংহতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাধারণ সত্যসমূহের অন্তর্নিবিষ্ট দৃঢ়ীকৃত রূপই হল দর্শন।

৯। শয়েগলার (Schwegler)-এর মতে, "Philosophy is reflection, the thinking consideration of things."[৯] অর্থাৎ দর্শন এক প্রকার প্রতিফলন তথা বস্তুনিচয়ের চিন্তামূলক ব্যাখ্যা, এখানে বর্হিজগৎ ও মনোজগৎ এই দুই সত্তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১০। শেলিং (Schelling)-এর মতে, "Philosophy is the attempt to determind what the world must be in order that it may be understood by mind, and what the mind must be in order that it may understand the world."[১০] অর্থাৎ জগৎ কি হবে যার ফলে জগৎকে জানতে পারবে এবং মন কি হবে যার ফলে মন জগৎকে জানতে পারে তার ব্যাখ্যা প্রয়াসকে দর্শন বলে।

১১। মারভিন (Marvin)-এর মতে, "Philosophy is love for the truth

the complete body of knowledge that includes in it all truths truths organised into one great system." [১১] অর্থাৎ দর্শন হল সত্যের প্রতি অনুরাগ-সকল সত্য যার অন্তর্ভুক্ত এমন জ্ঞানের পূর্ণ ভান্ডার। যাতে সকল সত্য এক মহান অখন্ডতার মধ্যে সুবিন্যস্ত।

১২। নব্য বস্তুবাদী দার্শনিক রাসেল (Russell)-এর মতে, "Philosophy is the logical study of the foundation of the science."[১২] অর্থাৎ দর্শন হল বিজ্ঞানসমূহের মূলভিত্তিগুলির যৌক্তিক বা বিচারমূলক আলোচনা। বিজ্ঞান যখন তার গবেষণার পথে অগ্রসর হয় তখন তার বিষয়বস্তুকে আলোচনার জন্য কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বিনা বিচারে স্বীকার করে নেয়। যেমন বিজ্ঞান দেশ, কাল, কার্য কারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বিনা প্রমাণে স্বীকার করে নেয়। দর্শনের কাজ হল বিজ্ঞানের এইসব স্বতঃসিদ্ধ ধারণা বা মূলভিত্তিগুলির যৌক্তিকতা বিচার করা। কাজেই দর্শন হল বিজ্ঞানসমূহের মূলভিত্তিগুলির যুক্তিগত বিচার বা আলোচনা।

১৩। পলসন (Poulsen)-এর মতে, "Philosophy is the sum total of all scientific knowledge"[১৩] অর্থাৎ দর্শন হল সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি বা যোগফল।

১৪। অধ্যাপক পেরী, (Perry)-এর মতে, "philosophy is neither accidental nor supernatural, but inevitable annd normal."[১৪] অর্থাৎ দর্শন আকস্মিক কিছু নয়, অলৌকিকও নয়, বরং অনিবার্য বা স্বাভাবিক।

১৫। কোঁত (Comte)-এর মতে, "Philosophy is the science of sciences."[১৫] অর্থাৎ দর্শন হল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান।

১৬। এ. জে. আয়ার (A.J.Ayer)-এর মতে, "Philosophy is the logical analysis of the propositions of the sciences."[১৬] অর্থাৎ দর্শন হল বিজ্ঞানের বচনগুলির যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। পাশ্চাত্য দর্শনে যৌক্তিক দৃষ্টিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে আয়ার, কারনাপ, উইটজেন্স্টাইন প্রভৃতি দার্শনিকদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে দর্শন হল 'ভাষার সমালোচনা।' যেমন উইটজেন্স্টাইন (Wittgenstein) বলেছেন, "Philosophy is the critique of language."

১৭। দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte)-এর মতে, Philosophy is the science of knowledge"[১৭] অর্থাৎ দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, দার্শনিক আলোচনা ছাড়া বিজ্ঞান তার

যাত্রাপথ শুরুই করতে পারে না, আবার বৈজ্ঞানিক আলোচনা ছাড়া দর্শন তার আলোচনার পরিপূর্ণতা আনয়ন করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক ওয়েবারের (weber) একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য— "The science, without philosophy are an aggreegate without unity, a body without a soul; philosophy without the sciences, is a soul without a body, differing in nothing from poetry and its dreams."[১৮] অর্থাৎ দর্শন ছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞান হল এক ঐক্য বিহীন সমষ্টিমাত্র, এক আত্মাহীন দেহ স্বরূপ, অপরদিকে বিজ্ঞান ছাড়া দর্শন হল এক দেহবিহীন আত্মা স্বরূপ, নিছক কবিতাগুচ্ছের ন্যায় কাল্পনিক, এবং স্বপ্ন থেকে এর বিশেষ কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

দর্শনের সংজ্ঞা নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে এতই বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় যে, রাসেল (B. Russell) একসময় রসিকতা করে বলেছিলেন—"দর্শন বিভাগে যা পড়ানো হয় তাই দর্শন। অর্থাৎ দর্শন বিভাগের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষিকা যা পড়ান তাই দর্শন।

দর্শনের কতিপয় সংজ্ঞার্থের বিচার

জগৎ, জীবন ও সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যে সব ধারণা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি তার যৌক্তিকতা বিচার ও মূল্য অবধারণই দর্শন। অর্থাৎ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তথা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানই হল দর্শন। জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং তার অর্থ ও মূল্য অবধারণ করাই দর্শনের কাজ। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক স্টিফেন (Stephen) -এর মত সামঞ্জস্যপূর্ণ— "The question is not one of philosophy or no philosophy, but one of good philosophy or bad every rational being has a philosophy of some kind."[১৯] অর্থাৎ মানুষ দর্শন চর্চা করবে, না কি করবে না, এটি প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল—ভালো বা মন্দ, এই দুই দর্শনের মধ্যে মানুষ কোনটি নির্বাচন করবে? প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের কোনো না কোনো ধরণের দার্শনিক মতবাদ আছেই।

এবার আমরা এই সংজ্ঞার্থের আলোতে দর্শনের প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞার্থ-এর যথার্থ বিচার করবো। অত্যন্ত প্রাচীনকালে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল দর্শনের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছিলেন। প্লেটো বলেন, শাশ্বত এবং বস্তু স্বরূপের জ্ঞানলাভ দর্শনের লক্ষ্য। অ্যারিস্টটল বলেন, দর্শন বস্তুর স্বরূপ এবং স্বরূপগত গুণের বিশ্লেষণকারী বিজ্ঞান। এই দুটি সংজ্ঞার্থেই দর্শন ও পরাবিজ্ঞান দর্শনের সমার্থক বলে মনে করা

হয়েছে। কিন্তু, একথা ঠিক নয়। পরাবিজ্ঞান দর্শনের একটি শাখা বা অঙ্গ। দর্শনের আরও শাখা আছে। সুতরাং দর্শনের কোন একটি শাখাকে সম্পূর্ণ দর্শন বলে মনে করলে দর্শন সম্পর্কে অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণা করা হয়। আমরা দর্শনের এই সংজ্ঞার্থ মানতে পারি না।

কোঁতে, পলসন—ভুন্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ দর্শনকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমষ্টিমাত্র বলে মনে করেন। কোঁতে বলেন, "দর্শন হল সকল বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই হল এর প্রচেষ্টা। পলসন বলেন, "দর্শন হল সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমন্বয় বা সমষ্টিমাত্র।" ভুন্ড বলেন, "দর্শন সেই সর্বব্যাপী বিজ্ঞান যাতে বিভিন্ন বিশেষ বিজ্ঞানের জ্ঞানসমূহের মিলনে একটি যুক্তিসঙ্গত মতবাদ স্থাপন করা হয়।"

দর্শনের এই মতবাদ সন্তোষজনক নয়। দর্শন হল পূর্ণ দর্শন। দর্শনের ব্যাপকতার তুলনায় বিজ্ঞান অতি সংকীর্ণ। দর্শন নিছক বিভিন্ন বিজ্ঞানের একটি সমন্বয় বা সমষ্টিমাত্র একথা বলা যায় না। দর্শনের নিজস্ব অনেক বিষয় আছে। যেমন পরমাদর্শের প্রশ্ন, যা বিজ্ঞান বহির্ভূত বিষয়। দর্শন কখনও অতীন্দ্রিয় পরম সত্তার তাত্ত্বিক আলোচনা বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের ন্যায় শুধু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষগোচর পদার্থের আলোচনা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-অভিজ্ঞতার সমালোচনায় নিবদ্ধ থাকে না, তাছাড়া অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিজ্ঞানের ফলাফল একত্রিত করা কি কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব? বিজ্ঞানের ফলাফলগুলিকে একত্র করলেই জগৎ সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক জ্ঞান পাওয়া যাবে, এমন কথা কি বলা যায়? এমন প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর হবে না। কারণ বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দর্শনরূপ একটা ব্যাপকতর বিজ্ঞান প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। কেননা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। দর্শন একদিকে যেমন সাধারণ জ্ঞান ও বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও বিধিগুলির যথার্থ বিচার করে তেমনি অপর দিকে এক সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎ ও জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য ও মূল নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হকিং (Hocking) বলেন, "What it does is to inquire what the grounds are on which beliefs are held and what grounds are good grounds."[২০] অর্থাৎ দর্শন যে কাজটি করে তা হল এই ধারণাগুলির ভিত্তি কি তা অনুসন্ধান করা এবং কোন্ কোন্ ভিত্তি যথার্থ তা নিরূপণ করা। দর্শনের লক্ষ্য হল আমাদের সাধারণ ধারণার মধ্যে ভ্রান্তি এবং অসঙ্গতিকে দূর করে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সুসংহত ও সুনিশ্চিত জ্ঞান দান করা।

দর্শনের প্রকৃতি বা স্বরূপ (Nature of Philosophy) :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দর্শনের প্রকৃতি বা স্বরূপের একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। কিন্তু দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু সামগ্রিক সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই পাঠকদের বিস্তারিত দর্শনের স্বরূপ জানার আগ্রহ এসে যায়। দর্শনের কাজ হল বস্তু বিষয়ক সমস্ত সমস্যার আলোচনা করা। তাই দার্শনিক জর্জ থমাস হোয়াইট প্যাট্রিক (George thomas white patrick) দর্শনের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "Philosophy is the art of thinking things through or, it is the habit of trying to think things through."[২১] অর্থাৎ দর্শন হল বস্তুর আদ্যোপান্ত চিন্তা কলা কিংবা বস্তুর আদ্যোপান্ত চিন্তা প্রয়াসের অভ্যাস।" এটা হল সমস্ত বস্তু তথা এদের ভেতরে যে এক সত্তা কাজ করে যাচ্ছে সে সত্তার যুক্তিযুক্ত আলোচনা। দর্শন হল বস্তুস্বরূপের সুস্পষ্ট, সুসামঞ্জস্য এবং সুশৃঙ্খল চিন্তা।

'ফিলসফি' (Philosophy) শব্দটির ব্যুৎপত্তি হয়েছে দুটি গ্রীক শব্দ থেকে 'Philos' ও sophia। 'philos' শব্দের অর্থ হল অনুরাগ বা ভালোবাসা (Love) আর 'sophia' শব্দটির অর্থ হল জ্ঞান (wisdom)। সুতরাং 'philosophy' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বা উৎপত্তিগত অর্থ হল—জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ (Love of wisdom)। সেজন্যই সক্রেটিস নিজেকে দর্শনের 'অনুরাগী বলে দাবী করতেন কিন্তু তিনি নিজেকে কখনোই দার্শনিক (Philosopher) বলে দাবী করতে পারেননি। কারণ তাঁর কাছে দার্শনিক শব্দের আরও ব্যাপকতর অর্থ আছে বলে। তবে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—একজন গণিতজ্ঞ বিখ্যাত পণ্ডিত পিথাগোরাস (Pythagoras) নিজেকে সর্বপ্রথম দার্শনিক (Philosopher) বলে দাবী করেছিলেন। অবশ্য জে.জে. রুশো (J.J. Rousseau) বলেছিলেন, "Man is a born philosopher" অর্থাৎ মানুষ জন্মসূত্রেই দার্শনিক।'

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্যতম অংশ রূপে মানুষ বিদ্যমান। জন্মের পর মানুষকে বাঁচতে হয় প্রকৃতির মাঝে। বাঁচার জন্য তার প্রয়োজন হয় প্রাকৃতিকে ভালোভাবে বোঝার, প্রকৃতি থেকে তার প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহকে বের করে নেওয়ার। ফলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই আরম্ভ করে প্রকৃতির বিচার, বিশ্লেষণ। প্রাকৃতিক জটিলতাকে নিজের আওতাধীন করে, নিজের কাজে লাগাতে মানুষ তাই অহরহ চেষ্টা করছে। ফলে সে চিন্তা করে কী করে প্রকৃতিকে বোঝা যায়। কী করে একে তার জীবনের প্রয়োজনে লাগানো যায়। আর তার এই চিন্তা থেকে কতগুলি সুষ্ঠ সুন্দর চিন্তা বের হয় যেগুলিকে বলা হয় দার্শনিক চিন্তা। তাই দর্শনের উৎপত্তি বা দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি মানুষের স্বভাবে এবং মানুষের প্রয়োজনে হয়। কানিংহাম

(cunningham) তাঁর "Problems of philosophy" গ্রন্থে বলেছেন "Philosophy grows directly out of life and its needs. Everyone who lives if he lives at all reflectively, is in some degree a philosopher."[২৩] অর্থাৎ দর্শনের জন্ম সোজাসুজি জীবন ও জীবনের প্রয়োজনে। প্রত্যেকে যিনি চিন্তার মাঝে বেঁচে আছেন তিনি কোনো না কোনো অর্থে দার্শনিক।

প্লেটোর মতে দর্শনের স্বরূপ : প্লেটো তাঁর গুরু সক্রেটিসের মতই জ্ঞানের প্রতি অনুরাগকেই দর্শন মনে করতেন। প্লেটো মনে করেন জ্ঞানের প্রতি অনুরাগই দর্শন। চরম সত্তার জ্ঞান আহরণ করাই দার্শনিকের মহান ব্রত। সত্য সাক্ষাৎকারই হল দার্শনিকের অভিষ্ট। দার্শনিক সত্যদ্রষ্টা। বস্তুস্বরূপের জ্ঞান বিশুদ্ধ বুদ্ধিতেই পাওয়া যায়। দার্শনিক সারসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত বলেই জীবনের ধ্রুপদী সত্য সম্পর্কে আমাদের জানাতে পারেন। যা মঙ্গল, যা শুভ, যা শ্রেয়, ও প্রেয়, এই বিষয়ে দার্শনিক আমাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করেন, দার্শনিকগণ বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং বিভিন্ন তাত্ত্বিক ধারণার বিচার বিশ্লেষণ করেন। সুস্পষ্ট, সুশৃঙ্খল, সংশয়মুক্ত জ্ঞানই দর্শনের লক্ষ্য। দর্শন বস্তুর অবভাসিক রূপটিকে অতিক্রম করে। তার প্রকৃত স্বরূপ বা সত্তাকে জানতে চেষ্টা করে। দর্শন যে কোনো বস্তু নয়, বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান। দর্শন হল বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান। উপরিউক্ত অভিমতটি অ্যারিস্টটল, হেগেল, ব্রাডলি প্রভৃতি দার্শনিকগণও পোষণ করেন। প্লেটো মনে করেন, নিত্যের এবং বস্তুর মূল স্বরূপের জ্ঞান লাভ করাই দর্শনের লক্ষ্য।"

প্লেটোর মতে, দৃশ্যমান জগতের অস্থায়ী বস্তুকে জানা প্রকৃত জ্ঞান নয়। এটা হল অভিমত (opinion) বা বিশ্বাস (belief)। অভিমত বা বিশ্বাসের পরিবর্তন হয়। অভিমত বা বিশ্বাস সবসময় যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অনেক সময় এগুলি মিথ্যা বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু জ্ঞান অপরিবর্তনীয়, যুক্তিভিত্তিক ও সত্য। বস্তুতঃ অতীন্দ্রিয় জগতের বুদ্ধিগম্য চিরস্থায়ী সত্তার জ্ঞানই দর্শন। প্লেটোর মতের দুটি রূপ—(১) বস্তুর বাহ্য রূপ, যা সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হয়। এটিকে অবভাস বলা হয়। (২) বস্তুর মূল স্বরূপ। এটি ইন্দ্রিয়াতীত। এটি অভিজ্ঞতায় প্রকাশিত হয় না। এটি সার্বিক, শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বস্তুর বাহ্যরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান দেয়। প্লেটো মনে করেন এই জ্ঞান প্রকৃত অর্থে জ্ঞান নয় একে তিনি অভিমত (Opinion) বলেছেন। এই জ্ঞান ব্যক্তিভেদে পৃথক ও পরিবির্তনশীল। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান নিত্য বস্তুগত ও সর্বকালে ও সর্বদেশে সত্য। অতএব এরূপ জ্ঞানের বিষয়বস্তুও নিত্য ও সামান্য সত্তা বিশিষ্ট হবে। অর্থাৎ সে জ্ঞান হবে অপরিবর্তনীয় বস্তু স্বরূপের জ্ঞান। এই ধারণায় জগৎই প্রকৃত সত্য এবং

জগতের স্বরূপ নির্ণয় করাই দর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তু। সুতরাং প্লেটো দর্শন বলতে অধিবিদ্যাকেই বুঝিয়েছেন।

বিচার (Criticism) : দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে প্লেটোর এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাঁর বক্তব্যে দর্শন ও অধিবিদ্যা অভিন্ন হয়ে উঠেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দর্শন অধিবিদ্যা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক, অধিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখামাত্র। দর্শনের উদ্দেশ্য হল বিশ্বের সমগ্র সত্যকে সম্পূর্ণভাবে জানা এবং তা জানতে হলে বস্তুর অবভাসিক বা বাহ্যিক দৃশ্যমান রূপকে উপেক্ষা করলে চলে না। বস্তুর বাহ্যরূপ না জানলে আমরা বস্তুর আসল রূপটিকে জানতে সক্ষম হই না। সুতরাং বস্তুর অবভাসিক (বাহ্য) ও প্রতিভাসিক (আন্তর) রূপ উভয়ই দর্শনে আলোচিত হয়।

অ্যারিস্টটলের মতে দর্শনের স্বরূপ : প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল তাঁর গুরুর দৃষ্টিকোণ থেকেই দর্শনকে অধিবিদ্যার অর্থে গ্রহণ করেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে, দর্শন ও অধিবিদ্যার লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন। তাঁর অভিমত হল দর্শন এমন এক বিজ্ঞান যা সত্তাকে সত্তা হিসাবে পর্যালোচনা করে, সত্তাকে বিশুদ্ধ সত্তা হিসাবে দেখে, সত্তার বিভিন্ন আংশিক দিক নিয়ে আলোচনা করে না— "Philosophy is the sccience of being, qua being, of being as such or pure being." অ্যারিস্টটল বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে মোটেই অস্বীকার করেন নি। বরং তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান বস্তুর আংশিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। বিভিন্ন বিজ্ঞান বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা দিক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু দর্শন এইসব বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের ঊর্দ্ধে এমন এক তত্ত্ববিজ্ঞান বা অধিবিদ্যা, যা বস্তুর স্বরূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং যে পরমসত্তার জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে। দর্শন হল সত্তার স্বরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনার শাস্ত্র—philosophy is the science which investigates the nature of being as it is in itself and the attributes which belongs to it in virtue of its own nature.".[২৪]

অ্যারিস্টটল মনে করেন, যা আমাদের পরম জ্ঞেয়, সেই মূল কারণের জ্ঞানই হল বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে আমাদের অজ্ঞানের, অন্ধকার সরে যায়। আধিবিদ্যক বিষয়ের পর্যালোচনাই দর্শনের উদ্দেশ্য। প্রত্যক্ষের দ্বারা লব্ধ অবভাসের জ্ঞান দার্শনিক আলোচনায় ঠাঁই পেতে পারে না। অ্যারিস্টটলের মতে বিশুদ্ধ সত্তার জ্ঞানই হল দর্শন। এই জ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্য আছে কিনা বড় প্রশ্ন নয়, সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনে যে জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান, তার অনুসন্ধান দার্শনিকদের ব্রত। খন্ড খন্ড বিজ্ঞানের বিভাগ বস্তুর খন্ড খন্ড দিক নিয়ে আলোচনা

করে, কিন্তু দর্শন চরম সত্তার প্রকৃতি বা স্বরূপের সাথে সংশ্লিষ্ট। তত্ত্ববিদ্যা বা অধিবিদ্যার অর্থে অ্যারিস্টটল দর্শনকে গ্রহণ করেছেন।

প্লেটোর মতোই অ্যারিস্টটল দর্শন বলতে অধিবিদ্যাকে বুঝিয়েছেন। তিনি অধিবিদ্যার উপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বলেছেন যে অধিবিদ্যাই আদিদর্শন (First philosophy)। তাঁর মতে অধিবিদ্যা এমন এক কেন্দ্রীয় নীতি নিয়ে আলোচনা করে, যার থেকে এই জগতের সকল বস্তুর বিশদ স্বরূপ অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন যে, অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল শুদ্ধসত্তা এবং একজন দার্শনিকের লক্ষ্য হল এই শুদ্ধসত্তাকে উপলব্ধি করা। এই শুদ্ধসত্তার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলল বলেছেন যে, এই শুদ্ধসত্তা হল সর্বব্যাপী ও সামগ্রিক। তাঁর মতে এই শুদ্ধসত্তার জ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। কারণ এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য হল জ্ঞানের জন্য জ্ঞান অনুসন্ধান করা, ব্যবহারিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করা নয়।

বিচার (Criticism) : প্লেটোর মতো যেহেতু অ্যারিস্টটলও মনে করেন দর্শন ও অধিবিদ্যা এক ও অভিন্ন সেহেতু একইভাবে এই মতও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অধিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখা মাত্র। তাছাড়া অ্যারিস্টটলের শুদ্ধসত্তার জ্ঞান অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও এই শুদ্ধসত্তা দার্শনিকের তত্ত্ব আলোচনার বিষয় বলে গণ্য হয়।

কান্টের মতে দর্শনের স্বরূপ : প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Critique of pure Reason' এ সর্বপ্রথম জ্ঞানবিদ্যার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে বলেন, দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যা হল অভিন্ন। তিনি আরও বলেন দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও তার সমালোচনা। কান্ট জ্ঞানের দুটি দিকের কথা বলেছেন। যথা—উপাদান (Matter) ও আকার (form)। জ্ঞানের উপাদান বলতে আমরা বুঝি সেইসব সংবেদন যেগুলি আমাদের মধ্যে বস্তুসত্তা (Reality) সৃষ্টি করে। জ্ঞানের আকার হল কতগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ (apriori) বা অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা যাদের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন সংবেদনসমূহ একীভূত ও সুসংবদ্ধ হয়। পূর্বতঃসিদ্ধ বা অভিজ্ঞতাপূর্ব আকার দুই ধরনের—অনুভবগত আকার এবং বুদ্ধিগত আকার। দেশ ও কাল হল অনুভবগত আকার। দ্রব্য, গুণ, কার্য, কারণ ইত্যাদি হল বুদ্ধিগত আকার। দেশ ও কালের জন্য সংবেদনকে গ্রহণ করে বুদ্ধি যখন তার উপর বোধজাত আকার (categories of understanding) আরোপ করে তখন জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। মন তার সংশ্লেষণী প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলিকে সুসংবদ্ধ করে জ্ঞানে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের উপাদান ছাড়া আকার শূন্য এবং আকার ছাড়া উপাদান অন্ধ (concepts without percepts are empty and percepts

without concepts are blind)। বুদ্ধির আকারের সাথে উপাদান সংযুক্ত হলেই জ্ঞান সম্ভব হয়।

কান্টের মতে বস্তুর দুটি দিক—একটি হল বস্তুর অবভাসিক দিক অর্থাৎ বস্তু যেভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় (The thing as it appears or phenomenon) ; অপরটি হল বস্তু স্বরূপ বা বস্তুর অতীন্দ্রিয় সত্তা (Thing in itself or Nonmenon)। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বহির্জগৎ হতে মন সংবেদনগুলি গ্রহণ করে। বস্তুস্বরূপই আমাদের মনে সংবেদনগুলি সৃষ্টি করে। সংবেদনগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র। এই সকল নিছক সংবেদনগুলি আমাদের কোনো জ্ঞান দিতে পারে না। কান্ট এই সংবেদনগুলিকে জ্ঞানের উপাদান বলেছেন।

কান্টের মতে এই দৃশ্যমান জগতেরই জ্ঞানলাভ সম্ভব এবং অতীন্দ্রিয় জগৎ হল অজানা ও অজ্ঞেয়। কারণ কোনো কিছুকে জানার অর্থই হল তাকে বুদ্ধির আকারে আকারিত করে জানা এবং এজন্যই আমরা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে কখনোই জানতে পারি না। এইভাবে কান্ট দেখিয়েছেন যে জ্ঞানবিদ্যার অতিরিক্ত কোনো দর্শন নেই। অধিবিদ্যা সম্ভব নয়, যেহেতু এর উদ্দেশ্য হল বস্তুর স্বরূপের আলোচনা করা। অনুরূপভাবে অন্যতম জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টে (Fichte) বলেন, "দর্শন হল জ্ঞান-সম্পর্কিত তত্ত্ব বা বিজ্ঞান" (philosophy is the docctrine or science of knowledge)। কান্ট এবং ফিক্‌টে উভয়ের মতে দর্শন কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার অনুসন্ধান নয়—দর্শনের কাজ হল জ্ঞানের পূর্বশর্ত বা প্রাক্ উপকরণের অনুসন্ধান ও তাদের বিচার বিশ্লেষণ।

বিচার (Criticism) : দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে কান্টের এই মতবাদ সন্তোষজনক নয়। কেননা তিনি দর্শন ও জ্ঞানবিদ্যাকে অভিন্ন মনে করায় দর্শনের সংজ্ঞা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কেননা জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের একটি শাখামাত্র। তাছাড়া কান্টের দর্শনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান তথা সুসংবদ্ধ ধারণার অবকাশ থাকে না। সুতরাং তাঁর চিন্তাধারায় দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়।

রাসেলের মতে দর্শনের স্বরূপ : ব্রিটিশ নব্যবস্তুবাদী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell) এর মতে স্বরূপগত দার্শনিক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে পৃথক নয় এবং যে সিদ্ধান্ত দর্শন লাভ করে তা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক নয় (philosophical knowledge does not differ essentially from scientific knowedge, and the results obtained by philosophy are not radically different from those obtained from science)। আসলে প্রত্যেক বিজ্ঞান কতগুলি মূলতত্ত্ব বিনা বিচারে মেনে নেয়। এগুলিকে 'স্বীকার্য-তত্ত্ব'

বলে। বিজ্ঞানের পক্ষে এগুলিকে আগে থেকে স্বীকার না করলে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এইরকম তত্ত্ব হল দেশ, কাল, দ্রব্যত্ব, অভেদত্ব, কার্য-কারণ সম্পর্ক ইত্যাদি, যেগুলি পার্থিব বস্তুর মধ্যে সাধারণ ধর্মরূপে বিরাজ করে। বিজ্ঞান এই তত্ত্বগুলিকে খুঁটিয়ে বিচার করে না। দর্শন বিচার করে দেখে দেশ, কাল, দ্রব্যত্ব, কার্য-কারণত্ব প্রভৃতি জ্ঞানগত প্রত্যয় না এগুলির পৃথক বিষয়গত সত্তা আছে। দর্শনের কাজই হল বিজ্ঞানের এইসব মৌলিক তত্ত্বের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। দর্শন বিজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র যে বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য, তা হল তার বিচারক্রিয়া। বিজ্ঞানে যেসব মৌলনীতি ব্যবহৃত হয় দর্শন সেগুলির বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক পরীক্ষা করে। ("The essential characteristic of philosophy, which makes it a study distinct from science is criticism. It examines critically the principles employed in science.")। এইভাবে দর্শন বিজ্ঞানগুলির মৌল ভিত্তিসমূহের যৌক্তিক জ্ঞান হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্য দর্শনের দুনিয়ায় বিংশ শতাব্দীতে ইঙ্গো মার্কিন দর্শনের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে সেই পরিবর্তন সাধনে নব্য বস্তুবাদী দার্শনিক রাসেলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিবর্তনের ফলে অনেক দার্শনিক দর্শনকে ভাষা বিশ্লেষণের সাথে মিলিয়ে ফেলেছেন। রাসেলই সর্বপ্রথম ভাষার দার্শনিক বিশ্লেষণকে দর্শনের পদ্ধতি হিসাবে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন। রাসেলের মতে, একটি শব্দ বা বাক্য যে বস্তুকে বোঝায় সেটি হল অর্থ। অতএব তাঁর কাছে ভাষার অর্থ বিশ্লেষণ হল ভাষার দ্বারা নির্দেশিত বিভিন্ন ধরনের বস্তুকে পরীক্ষা করা। শব্দগুলি অর্থপূর্ণ কারণ তার দ্বারা অন্য কিছুকে বোঝায়। সুতরাং যে সকল প্রতীকের অর্থ আছে সেগুলি কোনো এক প্রকার বস্তুকে অবশ্যই বোঝাবে। তাহলে একটি বাক্য যদি কোনো বাস্তব ব্যাপারের বর্ণনা হয়, তবে সেই বাক্যের মধ্যের শব্দগুলির সাথে বাস্তব ব্যাপারের মধ্যে উপস্থিত উপাদানের মিল থাকবে। অতএব একটি বাক্য এবং তার দ্বারা বিবৃত বাস্তব ব্যাপারের কাঠামো সদৃশ হবে। রাসেল উভয়ের এই সাধারণ আকারকে 'যৌক্তিক আকার' বলেছেন। রাসেল ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্য ও ব্যাপারের মধ্যে উপস্থিত এই সাধারণ আকারকে লাভ করতে চেয়েছিলেন। দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এইরূপ বিশ্লেষণের তাৎপর্য হল এর দ্বারা শুধু ভাষার স্পষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতা আসবে না, সেই সাথে ঐ ভাষার মাধ্যমে বর্ণিত জগৎ সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হবে। আমরা সুস্পষ্ট ভাষার মাধ্যমে বাস্তব ব্যাপারের প্রতিফলন পরীক্ষা করে আমাদের জগতের কাঠামো বা মূল গঠন কেমন তা বুঝতে পারব।

দর্শনের বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। বিজ্ঞানের সঙ্গে

দর্শনের পার্থক্য হল দর্শনের সামান্যীকরণের বিস্তৃতিতে, বিচার-বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় এবং দর্শনের বিশেষ বিশেষ সমস্যার মূল স্বভাব বা প্রকৃতিতে ("philosophy is distinguished from the science by the breadth of its generalisation, the refinement of its criticism and the ultimate character of its special problems.")।

বিচার (criticism) : দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে রাসেলের এই মতবাদ সন্তোষজনক নয়। কেননা দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি সামগ্রিক। দর্শনের ব্যাপকতার তুলনায় বিজ্ঞান অতি সংকীর্ণ। তার্কিক পরিভাষায় রাসেলের মতবাদ অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট।

হেগেলের মতে দর্শনের স্বরূপ : অ্যারিস্টটল ও সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস যেমন প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শন চিন্তার প্রধান প্রবক্তা ও প্রতিনিধি বলে পরিচিত হয়েছেন। হেগেলও তেমনি তাঁর সময়ের অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের দর্শনভাবনার প্রধান পুরোহিত হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। হেগেলের দর্শনকে জার্মান সরকার রাষ্ট্রীয় দর্শন হিসাবে মর্যাদা দিলেন। হেগেলের মতে, কোনো ব্যক্তির চিন্তাই তার যুগ বা সময়ের বহির্ভূত নয়। দর্শন হল যুগচিন্তার সময়োপযোগী প্রকাশ (Philosophy is its time apprehended in thoughts)। দর্শন ব্যাখ্যা করতে পারে কিন্তু তা পরিবর্তন করতে পারে না। দর্শনের কাজ হল ভাবজগতের বিশ্লেষণ। তাঁর দর্শন ও পদ্ধতি সম্পর্কে হেগেলের নিজেরই যথেষ্ট আস্থা ছিল। তিনি নিজেই জানালেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন সেই মৌলিক সূত্র যা সত্যকে, বাস্তবকে নিয়ন্ত্রণ করে। হেগেল দৃঢ়ভাবে জানালেন তাঁর চিন্তা পদ্ধতির সত্যতার কথা, তাঁর বিজ্ঞান-নির্ভর পদ্ধতির কথা। হেগেল (Hegel)-এর মতে, "Although I could not possibly think that the method which I have followed might not be capable of much perfecting, of much through revising in its details, I know that it is the only true method. It is clear that no method can be accepted as scientific that is not modelled on mine."[২৫]

হেগেলের দর্শনের মূল বক্তব্য হল চিন্তার মধ্যেই সত্যের প্রকাশ এবং এটাই স্বাভাবিক, বাস্তব। চিন্তাই সত্যের মন্দির। ঈশ্বর বা পরম শক্তির মধ্যেই চিন্তার অবস্থান। চিন্তাই আমাদের উপলব্ধির দরজা খুলে দেয়। চিন্তা পরিবর্তনশীল, বিকাশমান। যতক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা পরমের সাথে মিলে না যাচ্ছে, অর্থাৎ চিন্তার সাথে পরম ইচ্ছার মিলন যতক্ষন না ঘটছে, যুক্তি ও শক্তির একত্র অবস্থান না ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করবে। চিন্তার এই

পরিক্রমা বা গতি দ্বন্দ্বমূলক-প্রতিষ্ঠা, ধ্বংস, পুনর্নির্মাণ, এই পথেই সত্যের প্রতিষ্ঠা, সত্যের বিরোধিতা ও বিপরীত সত্যের আবির্ভাব এবং উভয় সত্যের সমন্বয়ে প্রকৃত সত্যের প্রকাশ ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ পরিণতি ঘটে। What is অর্থাৎ যা সত্য তা পরিচিত হল being বা বিদ্যমান রূপে। এটাই হল বাদ। এর বিপরীত বা বিরোধী সত্য বলে যা এল তা হল "What is not" অর্থাৎ 'not being' বা যা বিদ্যমান নয়। এটি হল প্রতিবাদ। বাদ ও প্রতিবাদ উভয় সত্যকে মিলিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল প্রকৃত সত্য। এটাই হল becoming অর্থাৎ যোগ্য বা পরিণত। এর নাম সম্বাদ।

হেগেল বলেন 'dialetic' অর্থাৎ দ্বন্দ্বের পথেই মানব মন খুঁজে পায় সত্য প্রতিষ্ঠার পথ। মানুষ হিসাবে আমরা কোনো কিছু সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করতে চাই। স্বভাবতই আমরা একটি মত প্রতিষ্ঠা করি। এই ধারণা বা মতের মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু যেহেতু মানুষ আবেগতাড়িত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অভ্রান্ত নয় সে ভুলও করে। মানুষের এই ভুলকে সামনে রেখে অন্য মানুষ আবার নতুন ধারণা বা মতবাদ দেয়। এখানেও সত্য আছে আবার ভুল আছে। প্রথম বা দ্বিতীয় দুটি ধারণা বা মতামত যেহেতু সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয় আমরা পেতে চাই একটি তৃতীয় পথ যা প্রকৃত সত্যে পৌঁছে দিতে আমাদের সাহায্য করে। এই তৃতীয় পথ আবিষ্কৃত হবে প্রথম ও দ্বিতীয়ের সমন্বয়ে। এটি হল 'New thesis' যা উভয়ের ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং নিজের অসঙ্গতি সম্পর্কে সচেতন। হেগেল মনে করেন, ".....there is no human view or belief without its rival....life is an incessant strife of partisan views. They are partisan because they are particular."[২৬] যা কিছু নির্দিষ্ট বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তা বিশেষ কলা, ধর্ম বা দর্শন যাই হোক না কেনো তা পক্ষপাতমূলক। এই ধরণের পক্ষপাতমূলক ধারণা বা মতবাদ মানব জীবনকে অস্থায়ী ও অনিশ্চিত করে তোলে। দ্বন্দ্ববাদ এই পক্ষপাতমূলক ধারণাকে অতিক্রম করে প্রকৃত ও অভ্রান্ত সত্যে পৌঁছানোর এক পথ। সেই সত্য অভ্রান্ত, চিরস্থায়ী, সুনিশ্চিত যা পরম সত্য। ঈশ্বর বা পরম ভাবের কাছেই পাওয়া যায় এই সত্য। হেগেল এখানে বার্কের রক্ষণশীল দর্শনের ধারনাকেই উপস্থিত করেন। বার্ক বলেছিলেন, যা আছে সেটাই ঐশ্বরিক (what exists is divine)। এই ঐশ্বরিক সত্তা ও অস্তিত্বকে বজায় রাখা ও উপলব্ধি করাই হল দর্শন।

বিচার (Criticism) : দর্শন সমগ্রের ব্যাখ্যা; কাজেই ব্যাপকতর পদ্ধতি দর্শনে অধিক শ্রদ্ধেয়। যে পদ্ধতি বা যে মতবাদের সাহায্যে সুষ্ঠভাবে যত অধিক বিষয় ব্যাখ্যা করা যায়। দর্শনের বিচারে সেই পদ্ধতি ততোধিক নির্ভরযোগ্য, সন্তোষজনক। হেগেলীয় পদ্ধতি সেই দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তবে তাঁর এই পদ্ধতি ঐক্যের বেদীমূলে বৈচিত্র্য হারায়।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের (Logical positivists) মতে দর্শনের স্বরূপ : আলফ্রেড জুলিয়াস এয়ার (A.J. Ayer), রুডলফ কারনাপ (Rudolf carnap), লুডউইগ ভিট্‌গেনস্টাইন (Ludwing wittgenstein), মরিশ স্লিক (Moritz schlick), প্রমুখ দার্শনিকগণ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সমর্থক। এ.জে. এয়ার দর্শনের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেন, "দর্শন হল ভাষা সংক্রান্ত সমালোচনা" (Philosophy is the critigue of language)। তাঁর মতে, জীবন ও জগতের প্রকৃত অর্থকে জানাই হল দর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ হতে পারে জ্ঞানতাত্ত্বিক বচনের বা ভাষার পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে। এয়ার দুই প্রকার বাক্য বা বচনের কথা বলেছেন—অর্থপূর্ণ (Meaningful) ও অর্থহীন (Meaningless)। অর্থপূর্ণ বাক্যগুলিকেই তিনি দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবী করেছেন।

তাঁদের মতে, দর্শন অভিজ্ঞতার বিচারও নয়, আবার অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোনো সত্তার জ্ঞানও নয়। দর্শনের একমাত্র কাজ হল বিভিন্ন বিজ্ঞানের ব্যবহৃত ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণ। অধিবিদ্যার সমস্যার উৎস হল ভাষাজনিত বিভ্রান্তি। তাঁরা দর্শনের রাজ্য থেকে সর্বপ্রকার অধিবিদ্যাকে নির্বাসিত করতে চান। এ প্রসঙ্গে তারা বলেন যে, অধিবিদ্যার বচনগুলি অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। দর্শন এক প্রকার বিজ্ঞানের ব্যাকরণ। বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের সম্পর্ক নিবিড়। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞান কখনোই অভিন্ন নয়। অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিচার (Criticism) : যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীদের এই বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়। যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীদের অভিমত মেনে নিলে আমাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও সৌন্দর্যগত চেতনার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এই মতবাদ মেনে নিলে দার্শনিক উপলব্ধির দিকটি উপেক্ষিত হয়ে পড়ে।

হারবার্ট স্পেন্সারের (Herbert spencer) মতে দর্শনের স্বরূপ : ব্রিটিশ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার দর্শনকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টিগত জ্ঞান নামে অভিহিত করেছেন। কোঁত এই মত সমর্থন করে বলেছেন, "দর্শন হল সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান।" অনুগামী পলসন বলেছেন, "দর্শন হল সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি।" হারবার্ট স্পেন্সারের মতে, বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করে। তবে কোনো বিজ্ঞানের পক্ষেই সমগ্র প্রকৃতি সম্পর্কে সার্বিক জ্ঞান দান করা সম্ভব হয়নি। দর্শন বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রামাণ্য সিদ্ধান্তগুলিকে সমন্বিত করার চেষ্টা করে। স্পেন্সার এই প্রসঙ্গে বলেছেন— "Common sense is completely ununified knowledge, science partially unified knowledge and philosophy completely unified or organised knowledge."[২৭] অর্থাৎ "সাধারণ জ্ঞান হল সম্পূর্ণ অনৈক্যবদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান অংশত ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান এবং দর্শন সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান।" কাজেই দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য হল ব্যাপকতার। বিভি বিজ্ঞান এই বিশ্বের এক একটি অংশ সম্পর্কে বিশিষ্ট জ্ঞান দান করে আর দর্শ সেই সব বিশিষ্টজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে এবং বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে সুসংব জ্ঞান দান করে— "The Generalizations of philosophy comprehend an consolide the widest generalizations of science, philosophy is th knowledge of the highest degree of Generality."[২৮] অর্থাৎ বিজ্ঞানে জ্ঞান আংশিকভাবে একত্রীভূত এবং দর্শনের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে একত্রীভূত। দর্শ বিজ্ঞানকে সার্বিকভাবে বোধগম্য ও সংহতিপূর্ণ করে তোলে। দর্শন হচ্ছে সার্বিকতার সর্বোচ্চজ্ঞান। তাই সৌন্দর্য দর্শনের সার্বিক আলোচনায় দর্শনের অখন্ড জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

স্পেনসারের মতে, এই মহাবিশ্বে জড়, গতি ও শক্তির যে প্রকাশ ঘটেছে প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে সমস্ত বস্তুর যে ক্রমিক বিবর্তন ও পরিবর্তন হচ্ছে—সরল থেকে জটিল স্ফুট থেকে স্ফুটতর, অসংহত থেকে সংহত এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সর্বব্যাপী ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান দান করাই হল দর্শনের লক্ষ্য।

বিচার (Criticism) : স্পেনসারের মত সমালোচকের দৃষ্টিতে সন্তোষজনক নয়। কেননা, বিজ্ঞান কেবলমাত্র প্রত্যক্ষযোগ্য জগৎ নিয়ে আলোচনা করে আর দর্শন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় উভয় জগৎ নিয়ে আলোচনা করে। দর্শন ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিও পৃথক। কেননা, বিজ্ঞান যেখানে বস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দর্শন সেখানে বস্তুর স্বরূপ বিশ্লেষণ ছাড়াও বস্তুর মূল্যাবধারণ করে। যদি ধরা যায় যে, দর্শন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমন্বয় তাহলে একথা বলতে হবে যে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের এত বেশি অগ্রগতি ঘটেছে যে এজন সসীম মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সমূহের সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয়।

সাধারণ জ্ঞান (Common Sense) :

ব্রিটিশ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) বলেন, "সাধারণ জ্ঞান হল অনৈক্যবদ্ধ জ্ঞান, বিজ্ঞান হল আংশিকভাবে ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান এবং দর্শন হল সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান" (Common sense is ununified knowledge, science is partially unified knowledge and philosophy is completely unified knowledge)। অবশ্য স্পেনসারের এই উক্তিটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়।

কারণ, দর্শনকে পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান বলা যায় না, আবার সাধারণ জ্ঞানকে পুরোপুরি ঐক্যবর্জিত জ্ঞান বলা যায় না। সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঐক্য থাকে। তবে একথা ঠিক যে জীবন ও জগতের গভীরে যে জটিল প্রশ্ন বা নিয়ম শৃঙ্খলা বিরাজ করে, তার কোনো সুসংবদ্ধ ও সুসংহত ধারণা সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে থাকে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্পেনসার এর উক্তিটি আংশিকভাবে সত্য। সাধারণ জ্ঞান বলতে বোঝায় কোনো সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনাহীন সাধারণ মতামতের সমষ্টি। এইসব মতামত বিচার-বিশ্লেষণহীন, অযৌক্তিক। জগৎ-জীবন, দেহ-মন, দেশ-কাল, কার্য-কারণ, জ্ঞান, ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণহীন, বিশৃঙ্খল ও লঘু মতামত হল সাধারণ জ্ঞান। এইসব মতামত প্রায় অস্পষ্ট, অসঙ্গত, অযৌক্তিক আন্দাজ বা অনুমান। এইসব মতামত আবার ঐতিহ্যগত বিশ্বাসনির্ভর। এইগুলি নির্বিচারবাদী ও কৃত্রিম।

সাধারণ জ্ঞানের উৎস ও উদ্দেশ্য : অতি সামান্য কিছু সংখ্যক লোকের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেও মানুষ প্রধানত সাধারণ জ্ঞান দ্বারাই পরিচালিত হয়। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের কতগুলি সুস্পষ্ট শর্ত সীমা রয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম পরিচালনার উদ্দেশ্যেই সাধারণ জ্ঞান উৎপত্তি লাভ করে। এর উৎস মূলে রয়েছে সাধারণ প্রত্যক্ষণ, প্রমাণহীন মতামত, ঐতিহ্য, কম বেশি লঘু চিন্তা। অতএব, সাধারণ জ্ঞান প্রায় ভ্রম পরিপূর্ণ এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজন হয়।

দর্শনের উদ্দেশ্য : পক্ষান্তরে, দর্শনের উদ্দেশ্য হল নির্ভুল জ্ঞান কিংবা সত্যতা অনুসন্ধান। দর্শন কোনো প্রতিপক্ষীয় মতামত কিংবা ঐতিহ্যকে বিনা বিচারে, বিনা বিশ্লেষণে গ্রহণ করে না। দর্শনের পদ্ধতি হল পক্ষপাতহীন নিরীক্ষণ এবং যুক্তিযুক্ত চিন্তাভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ। সাধারণ জ্ঞান যে একেবারে বিচার বিবেচনাহীন এবং সাপেক্ষ তা নয়, তবে এক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ বিচার বিবেচনার এবং পক্ষপাতহীনতার অভাব রয়েছে। সাধারণ জ্ঞান ধৃত ভ্রমাত্মক ধারণায় ইতিহাস পরিপূর্ণ। এর দৃষ্টিসীমা সংকীর্ণ ও চরিত্র রক্ষণশীল। অবিশ্বাসী প্রতিপক্ষীয়দের প্রতি এর দৃষ্টি সন্দেহজনক ও শত্রুভাবাপন্ন। কিন্তু দর্শনের দৃষ্টি উদার, প্রসারিত। দর্শনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে সর্বদা সমালোচনা, বিচার বিবেচনা পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের স্থান থাকে।

সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক : সাধারণ জ্ঞানের সুসংহত রূপ হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুবিন্যস্ত রূপ হল দার্শনিক জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান সুসংহত ও সুবিন্যস্ত হলেই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়;

আবার, বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয়ে সুসংবদ্ধ হলে দার্শনিক জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হয়। কাজেই, সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যে পার্থক্য তা কেবল মাত্রাগত, জাতিগত নয় (Common sense, science and philosophy do not differ in kind but only in degree)। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল সাধারণ জ্ঞানের অসংবদ্ধতাকে দূর করে প্রকৃতির একটি বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করা এবং দর্শনের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলিকে বিচার করে বিশ্ব সম্পর্কে একটি সামগ্রিক সুসংহত জ্ঞান দান করা। সুতরাং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল, একটি অপরটির পরিপূরক।

আংশিকভাবে অন্তত সাধারণ জ্ঞানে অসন্তোষ প্রকাশেই দর্শনের যাত্রা শুরু। দর্শনের উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এবং দার্শনিক অভিমতগুলির উন্নতি সাধনকল্পে দর্শন সাধারণ জ্ঞানকে বিবেচনার বাইরে রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে, ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য সাধারণ জ্ঞান স্বনির্ভর হতে পারে না এবং যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় এর পরিমার্জন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এই যৌক্তিক প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োগ করেই সাধারণ জ্ঞানকে দার্শনিক জ্ঞানে উন্নীত করা হয়। অন্যথায়, এইসব জ্ঞান শেষ পর্যন্ত ভুলের চাপে ভেঙে পড়ে এবং এদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। অতএব, দর্শন ও সাধারণ জ্ঞানের সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য : সাধারণ জ্ঞান বলতে বোঝায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সেইসব অভিমত যা সাধারণ মানুষ বিনা বিচারে সত্য বলে গ্রহণ করে। সাধারণ জ্ঞানে কিছু সত্য বা তথ্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা অসঙ্গতিপূর্ণ, খন্ড ও বিচ্ছিন্ন। তবে সাধারণ জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পথিকৃৎ বলা যায়। প্রকৃতির কোনো বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে যথাযথ, সুশৃঙ্খল ও সুসম্বদ্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। প্রত্যেক বিজ্ঞান নিজের নির্দিষ্ট বিভাগের ঘটনাগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে তাদের অন্তর্নিহিত সার্বিক নিয়মগুলি আবিষ্কার করে খন্ড ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে একত্রে গ্রথিত করে ও ব্যাখ্যা করে। সাধারণ জ্ঞানকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খল করার প্রচেষ্টা থেকেই বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে। টমাস হাক্সলির (Huxley) মতে, "বিজ্ঞান হল পরিশীলিত ও সুসংগঠিত সাধারণ জ্ঞান"। দর্শনকেও অনুরূপভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুসম্বদ্ধ ওপরিশীলিত রূপ বলা যায়।

কানিংহাম (Cunningham)-ও বলেছেন, "সাধারণ জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে আসতে গেলে আমরা যেমন পররাজ্যে প্রবেশ করি না, তেমনই বিজ্ঞান থেকে দর্শনে আসতে গেলেও আমরা অভিজ্ঞতার এলাকা ছাড়িয়ে যাই না।" ("In passing from the science to philosophy, as in passing from common sense to science

we are not entering upon a wholly new and untouched territory.")। কাজেই সাধারণ জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে একই জ্ঞানের তিনটি স্তর।

দর্শন একদিকে সাধারণ জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও বিধিগুলির যথার্থ বিচার করে এবং অন্যদিকে এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগৎ ও জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য ও মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করে। প্রথমটি হল দর্শনের সমালোচনামূলক বা বিচারমূলক (critical) কাজ; এবং দ্বিতীয়টি হল তার গঠনমূলক (Constructive) কাজ। এই দুই প্রকার কাজের মধ্য দিয়ে দর্শন যে জ্ঞান অর্জন করে, তা অখন্ড বা সামগ্রিকভাবে সুসংহত জ্ঞান।

সাধারণ জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য : কার্নিংহাম সাধারণ জ্ঞানের কতগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন (১) সাধারণ জ্ঞান হল একগুচ্ছ মতবাদ, (২) সাধারণ জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং (৩) সাধারণ জ্ঞান বিনা বিচারে গৃহীত।

প্রথমত : সাধারণ জ্ঞান আমাদের নিজেদের ও আমাদের জগতকে কেন্দ্র করে একগুচ্ছ মতবাদ (a set of theories)। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে কোন মতবাদ থাকে না, সাধারণ জ্ঞান হল মতবাদবর্জিত জ্ঞান। কিন্তু কানিংহাম বলেন, সাধারণ জ্ঞানকে মতবাদ বলতে হবে এই কারণে যে, অভিজ্ঞতায় জগতকে যেমনভাবে পাওয়া যায় সাধারণ জ্ঞান তাকে ঠিক তেমনভাবে বিবৃত করে না। যেমন আমরা সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত হতে এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যেতে দেখি এবং এও দেখি যে, পৃথিবী স্থির হয়ে আছে। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে বলা হয় যে, পৃথিবী ঘোরে আর সূর্য স্থির থাকে। একটি ঘুড়ি আকাশে যত উঁচুতে ওঠে ততই তাকে ছোট দেখায়। কিন্তু তবু আমাদের সাধারণ জ্ঞান বলে, ঘুড়িটির আকারে কোনো পরিবর্তন হয়নি। ঘুড়িটির আকারের অপরিবর্তনীয়তা সম্পর্কে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষগোচর নয়, তা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা জ্ঞান, অর্থাৎ তা একটি মতবাদ। এখানে মনে রাখা দরকার, সাধারণ জ্ঞানকে 'মতবাদ' বলার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ জ্ঞান বিচারবুদ্ধিযুক্ত সুসম্বদ্ধ একটি মতবাদ, বরং একথাই বলা উচিত যে, সাধারণ জ্ঞান হল একগুচ্ছ মতবাদ বা সতত পরিবর্তনশীল।

দ্বিতীয়ত : সাধারণ জ্ঞান অনেকাংশে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান কোনো বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাভাবনার ফল নয়। এই জ্ঞান মানুষ লাভ করেছে তার পূর্বপুরুষের নিকট থেকে। ঐতিহ্য ও ভাষার মাধ্যমে এই জ্ঞান পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষ সঞ্চারিত হয়। ব্যক্তি যে গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করে সেই গোষ্ঠীর কতগুলি ঐতিহ্য, সংস্কার, রীতিনীতি থাকে। এইসব

রীতিনীতি, ঐতিহ্য ও সংস্কারকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গোষ্ঠীর মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

তৃতীয়ত : অধিকাংশ সাধারণ জ্ঞান বিচারযুক্ত সংস্কারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এইজন্য সাধারণ জ্ঞান সত্যতা নির্ধারণের কোনো সন্তোষজনক মানদন্ড দিতে পারে না বলে কোন্ জ্ঞান সত্য আর কোন্ জ্ঞান মিথ্যা তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়। যেহেতু সাধারণ জ্ঞান বংশানুক্রমে প্রাপ্ত এবং আমরা এগুলি নির্দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করি সেইজন্য সাধারণ জ্ঞান বিচারবিযুক্ত হয়ে থাকে।

চতুর্থত : আমাদের পারিপার্শ্ব সম্পর্কে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে কিছুটা সত্যতা থাকলেও এর অধিকাংশ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। এইসব ব্যাখ্যা এত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট যে, তারা ঠিক কি বোঝাতে চায় তা বুঝে ওঠা কঠিন।

পঞ্চমত : সাধারণ জ্ঞান পরিবর্তনশীল। সাধারণ জ্ঞান যুগে যুগে ভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এমনকি গোষ্ঠী ভেদেও সাধারণ জ্ঞানের বিভিন্নতা দেখা যায়।

ষষ্ঠত : সাধারণ জ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই অসঙ্গতিপূর্ণ। এই জ্ঞানের মধ্যে এমন অনেক স্ববিরোধিতা থাকে যা আমাদের বুদ্ধির কাছে ধরা পড়েনি। সাধারণ মানুষ জগৎ, ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি সম্পর্কে নানা ধরনের অভিমত পোষন করে। কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যাবে যে, এইসব অভিমতের মধ্যে নানা অসঙ্গতি আছে।

সপ্তমত : দেশ-কাল-গোষ্ঠী নির্বিশেষে গ্রহণ করলে সাধারণ জ্ঞানের পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। সাধারণ জ্ঞানের পরিসরের মধ্যে কত বিষয়ের জ্ঞান যে অন্তর্ভুক্ত তা গণনা করে শেষ করা যায় না। একজন সাধারণ মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ ও এই পরিবেশের অন্তর্গত সব জিনিস সম্পর্কেই কিছু কিছু জ্ঞান রাখে।

অষ্টমত : সাধারণ জ্ঞান অসম্বদ্ধ, খন্ড ও বিচ্ছিন্ন জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞান খন্ড খন্ড জ্ঞানের সমষ্টি। কিন্তু এইসব খন্ড খন্ড জ্ঞানের পারস্পরিক কোনো সম্পর্কের জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানে থাকে না বলে সাধারণ জ্ঞানে সংহতি ও শৃঙ্খলার অভাব থাকে।

সাধারণ জ্ঞানের উপযোগিতা : সাধারণ জ্ঞান ত্রুটিমুক্ত না হলেও সাধারণ জ্ঞানের কিছু উপযোগিতা আছে। যে কোনো মানবগোষ্ঠীর দ্বারা বিনা বিচারে ও বিনা বিশ্লেষণে গৃহীত অভিমতের সমষ্টিগত রূপই সাধারণ জ্ঞান। জ্ঞান অন্বেষণ মানুষের একটি স্বাভাবিক আকাঙ্খা। সাধারণ জ্ঞান এই আকাঙ্খার প্রাথমিক ফল। এই হিসাবে সাধারণ জ্ঞান অন্যান্য জ্ঞানের ভিত্তি। একথাও বলা যায় যে, সাধারণ জ্ঞান হল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞানের পথিকৃৎ। এছাড়া সাধারণ জ্ঞানে কিছু কিছু সত্য তথ্যও আছে এবং কালক্রমে সেগুলি বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে অথবা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিজ্ঞান (Science) :

প্রকৃতির এক একটি বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে যথাযথ সুনিশ্চিত, নির্ভুল, সুশৃঙ্খল জ্ঞানই হল বিজ্ঞান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পদার্থবিজ্ঞান পদার্থের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। জীববিজ্ঞান জীবের উদ্ভব, স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, গতি ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। অর্থবিজ্ঞান অর্থের স্বরূপ এবং ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি নিয়ে যথাযথভাবে আলোচনা করে। বিজ্ঞান তাই প্রকৃতির এক একটি বিভাগ সম্পর্কে কিছু সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে এবং এই সমস্ত সাধারণ সূত্র বা নিয়মগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে দিক নির্ণয়ের চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানিক আলোচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতির উল্লেখ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়,তা হল মূলতঃ পর্যবেক্ষণ (Observation), পরীক্ষণ (Experiment) এবং আরোহ মূলক (Inductive Method)। এই জাগতিক জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর দ্বিবিধ সত্তা বিদ্যমান—বাহ্য সত্তা (Appearence বা Phenomenon) এবং প্রকৃতবস্তুর সত্তা (Reality বা Noumenon)। বস্তুর এই বাহ্য সত্তা নিয়ে আলোচনা করে বিজ্ঞান। বস্তুর এই বাহ্যরূপকে পর্যবেক্ষণ করা যায়, প্রয়োজনমতো তার সম্পর্কে পরীক্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। বস্তুর এই বাহ্যরূপের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ ক্রিয়ার মাধ্যমে বস্তুর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে খুঁটিনাটি ভাবে জ্ঞাত হয়ে আরোহমূলক পদ্ধতির ভিত্তিতে একটি সার্বিক নিয়ম রচনা করে বিজ্ঞান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংবদ্ধ দিক নির্দেশ করে।

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য : বিজ্ঞান সাধারণ ধারণার পরিণত রূপ হলেও তার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

প্রথমত : বিজ্ঞান জগতের অবভাসিক রূপ নিয়ে আলোচনা করে।

দ্বিতীয়ত : বিজ্ঞান জগতের এক একটি বিশেষ বিভাগ নিয়ে আলোচনা করে।

তৃতীয়ত : বিজ্ঞান কতগুলি সাধারণ নিয়মের মাধ্যমে বিশেষ বিষয়কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে।

চতুর্থত : বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল আরোহ পদ্ধতি (Induction), পর্যবেক্ষণ (Observation) ও পরীক্ষন (Experiment)।

পঞ্চমত : বিজ্ঞানে আবেগ, অনুভূতি, উচ্ছ্বাসের ঠাঁই নেই।

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক : জগৎ ও জীবনের জটিলতর সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করা যেহেতু বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ের লক্ষ্য সেহেতু তাদের মধ্যে কিছু দৃষ্টিভঙ্গী গত, পদ্ধতিগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

প্রথমত : অভিজ্ঞতার রাজ্যে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েরই বিচরণ। অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলির মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক আবিষ্কার করে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া উভয়েরই কাজ।

দ্বিতীয়ত : সুসংহত সাধারণ জ্ঞান যেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত, ঠিক তেমনই আবার সুবিন্যস্ত পরস্পর সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দর্শনের পর্যায়ে উপনীত হয়।

তৃতীয়ত : সত্যের অনুসন্ধান, জ্ঞানের অন্বেষনই দর্শন ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য। তবে জটিল জীবন জিজ্ঞাসার মর্ম উদ্ধার করতে গিয়ে বিজ্ঞান যেখানে থেমে যায়, দর্শন সেখানে থামে না। দার্শনিকের দৃষ্টি আরও সুদূরে, অনন্তের গভীরে। তাই বলা হয়, বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, দর্শনের সেখানে শুরু (Where science ends, philosophy begins)।

আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতার বা ধারনার উপর নির্ভর করে পাই সাধারণ জ্ঞান। এই সাধারণ জ্ঞানকে পরিমার্জন ও পরিশ্রুত করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে লাভ করি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যখন আরও সুনিয়ন্ত্রিত, সুবিন্যস্ত ও সুসংহত হয়ে সমগ্র জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়, তখনই তা দার্শনিক জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হয় অর্থাৎ সমস্ত প্রকার জ্ঞানের শেষ পরিনত জ্ঞান হল দর্শন। সেই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, দর্শনের সাথে যে কোনও জ্ঞানের সংযোগ আছে। বিজ্ঞানের সঙ্গেও দর্শনের তাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। বিজ্ঞান যেমন সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, দর্শনও তেমনই বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে কাজে লাগিয়ে বিশেষ রূপে জ্ঞান আহরণ করে, দর্শন সেই সমস্ত বিশেষ বিশেষ জ্ঞান নিয়ে এক সার্বিক জ্ঞানসূত্র রচনা করে। বিজ্ঞান যেন এক একটি ফুল এবং দর্শন হল বিশেষ বিশেষ ফুলের সমন্বয়ে গ্রথিত এক সার্বিক মালিকা। বিজ্ঞান যেন এক একটি বিশেষ নদী ধারা বা প্রপাত, আর দর্শন যেন মহাসমুদ্র যেখানে সমস্ত জলধারা এসে মিশেছে এবং সমস্ত জলধারা তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব হারিয়ে এক সার্বিক সৌন্দর্য রচনা করেছে। সমগ্রের সাথে অংশের যে সম্পর্ক, দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের ঠিক একই সম্পর্ক।

বিজ্ঞান ও দর্শনের পার্থক্য : বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা—

প্রথমত : বিজ্ঞান প্রকৃতির এক একটি নির্দিষ্ট বিভাগ নিয়ে আলোচনা করে, জগৎ সম্পর্কে আমাদের কোনও সামগ্রিক জ্ঞান দেয় না।

কিন্তু দর্শন সমগ্র বিশ্ব জগৎকে আলোচনা কররে এবং সামগ্রিক জ্ঞান দেয়।

দ্বিতীয়ত : বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। কিন্তু দর্শনের আলোচ্য বিষয় হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগৎ উভয়ই।

তৃতীয়ত : বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় পর্যালোচনার জন্য কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যেমন কার্য-কারণ সম্বন্ধ ও মৌলিক তত্ত্ব যেমন দেশ কাল ইত্যাদির অস্তিত্ব বিনা বিচারে স্বীকার করে নেয়, কিন্তু দর্শন কখনও কোনো সত্য বা মৌলিক নীতিকে গ্রহণ করে না।

চতুর্থত : বিজ্ঞানের পদ্ধতি হল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, শ্রেণিকরণ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ। কিন্তু দর্শনের পদ্ধতি হল বুদ্ধির সাহায্যে বিষয়বস্তুর বিচার বিশ্লেষণ করা।

পঞ্চমত : বিজ্ঞান যেখানে তার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আরোহ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করে, দর্শন সেখানে সেই সিদ্ধান্তগুলিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণ করে অবরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

ষষ্ঠত : পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিজ্ঞান জগতের আলোচনা করে। প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকে বিজ্ঞান পরিমাপ করে, ওজন করে এবং সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। কিন্তু দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি গুণগত। বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনার গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করাই দর্শনের কার্জ।

সুতরাং দর্শন ও বিজ্ঞান-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও উভয়েই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি দর্শনের দ্বারাই ব্যাখ্যাত, একীভূত ও সুবিন্যস্ত হয়। বিজ্ঞান যে তত্ত্বগুলি স্বীকার করে নেয় তাদের সত্যতা যাচাই করা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীগণ কার্যকারণবাদের আলোচনা করেন, কিন্তু এর তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন না। দর্শন এইগুলির আলোচনা করে, ও এক সামগ্রিক জ্ঞান দান করে। এদিক থেকে বিজ্ঞান দর্শনের কাছে ঋণী। আবার এটা প্রমাণিত যে, দর্শন বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেমন বিজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত উপকরণ ছাড়া দর্শন জগৎ ও জীবনের সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যাবধারণ করতে পারে না। দর্শন যেমন বিজ্ঞানের ভিত্তি ছাড়া অলস কল্পনামাত্র, বিজ্ঞানও তমনি দর্শনের সাহায্য ছাড়া আংশিক জ্ঞান মাত্র। ওয়েবার (Weber)-এর মতে, "দর্শন ছাড়া বিজ্ঞানসমূহ ঐক্য ছাড়া সমষ্টিমাত্র, আত্মাহীন দেহমাত্র। আবার বিজ্ঞান ছাড়া দর্শন হল, দেহহীন আত্মা। নিছক কবিতা ও স্বপ্ন থেকে এর পার্থক্য বিশেষ নেই।"[২৯] তাই অধ্যাপক প্যাট্রিক (Patric) বলেন, "They have the same spirit and the same purpose-the honest and labours search for truth" অর্থাৎ "তাদের (বিজ্ঞান ও দর্শনের) একই প্রকৃতি এবং একই উদ্দেশ্য-সত্যের জন্য সৎ এবং শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান কার্য"।

দর্শন (Philosophy) :

দর্শন (Philosophy) বস্তুর অবভাসিত রূপ ছাড়াও যে প্রকৃতরূপ বা সত্তা (Reality) আছে। তার সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা করে। কোন বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান লাভ করা কোনো বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান বস্তুর একটিমাত্র দিককে উন্মোচন করে। কিন্তু দর্শন বস্তুর পরিপূর্ণ দিককে আমাদের জ্ঞানের রাজত্বে প্রতিষ্ঠা করে। কোনো বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করার জন্য একদিকে যেমন তার বাহ্যরূপের জ্ঞান প্রয়োজন, অপরদিকে ঠিক তার সত্তা সম্পর্কিত জ্ঞানেরও দরকার। এই কাজটি সম্পন্ন করে দর্শন। দর্শন বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে অস্বীকার না করেও, তার সত্তা সম্পর্কিত রূপটির আলোচনায় নিয়জিত। বস্তু সত্তার এই জ্ঞান আমাদের ঐন্দ্রিক জগতের আঙিনায় আবদ্ধ নয়, এটি অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। দার্শনিক জ্ঞানকে তাই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা যায় না। এটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধির বিষয়। এই উপলব্ধির প্রচেষ্টাই মানুষকে দার্শনিক করে তুলেছে। উপলব্ধির আকাঙ্খা জন্মসূত্রেই বলে প্রত্যেকটি মানুষই জন্মসূত্রে দার্শনিক (Man is born philosopher) । জগৎ বা প্রকৃতিকে বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিভাজন প্রক্রিয়া হল বিজ্ঞান। কিন্তু বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে যখন প্রকৃতি বা বিশ্বকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য (Unity in diversity) রূপে উপলব্ধি করা হয়—তখনই তা দর্শন (Philosophy) পদবাচ্য হয়। এখানেই পলসন (Poulsen) এবং কোঁতের সংজ্ঞা দুটির সার্থকতা। হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) তাই যথার্থই বলেছেন— "Philosophy is the synthesis of different science" অর্থাৎ দর্শন হল সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ জ্ঞান। একই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন দার্শনিক ভুন্ডট (Wundt) এবং তিনি বলেন— "Philosophy is the unification of all knowledge obtained by the special science in a consistent whole." অর্থাৎ বিভিন্ন বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে একত্রীভূত করে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যে পৌছানোই হল দর্শন।"

সাধারণভাবে আমরা বলে থাকি, দর্শনে বিশ্ব সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কান্ট বলেন, জ্ঞানের যথার্থ প্রকৃতি পরিধি অর্থাৎ সীমা নির্ণয়ের পর নির্ধারণ করা যেতে পারে। বিশ্বের সামগ্রিক জ্ঞানলাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব কিনা? এইজন্য কান্টের দর্শনের প্রাথমিক প্রশ্নই হল জ্ঞান সম্ভব কিনা? কি কি উপাদানের দ্বারা জ্ঞান গঠিত এবং জ্ঞানের সীমা কতখানি? এই প্রসঙ্গে কান্ট জ্ঞানের বস্তুগত ও আকারগত (Meterial and formal) উপকরণের মধ্যে, পার্থক্য দেখিয়ে বলেন যে, জ্ঞানের বস্তুগত উপকরণ হল সংবেদন (Sensation) এবং এরা

আসে মনের বাইরে অবস্থিত জগৎ থেকে। অপরপক্ষে জ্ঞানের আকারগত উপকরণ আসে মনের ভিতর থেকে। এই দুই জাতের উপকরণ দিয়ে গঠিত জ্ঞান অবভাসিক জগতেই সীমাবদ্ধ। বিশ্বের স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তাই কান্টের সিদ্ধান্ত হল জ্ঞানবিদ্যার অতিরিক্ত কোন দর্শন নেই। কিন্তু বিশ্বের এমন কিছুই থাকতে পারে না যা দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। জন কেয়ার্ড যথার্থই বলেছেন— "There is no province of human experience, there is nothing in the whole realm of reality, which lies beyond the domain of philosophy or to which philosophical investigation does not extend.".[৩১]

দর্শনের বৈশিষ্ট্য :

প্রথমত : দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি হল সামগ্রিক।

দ্বিতীয়ত : দর্শনের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ।

তৃতীয়ত : দর্শন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান দান করে।

চতুর্থত : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এবং অতীন্দ্রিয় জগৎ উভয়ই দর্শনে আলোচনার বিষয়।

পঞ্চমত : দর্শন যেমন সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি তেমনি সকল বিজ্ঞানের সেরা বিজ্ঞান।

ষষ্ঠত : দর্শন বস্তুর আভাসিক রূপ থেকে তার স্বরূপকে বিচ্ছিন্ন না করে আলোচনা করে বলে তার ফল মূর্ত।

সপ্তমত : দর্শন বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

অষ্টমত : দর্শনের পদ্ধতি হল পক্ষপাতহীন, নিরীক্ষণ এবং যুক্তিযুক্ত চিন্তাভাবনা, বিচার বিশ্লেষণ।

নবমত : দর্শন বিভিন্ন বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে সমালোচনা করে সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

দশমত : দর্শন মানুষের আচার আচরণের মূল্য বিচার করে।

দার্শনিক কেয়ার্ড (Caird)-এর মতে "There is no province of human experience, there is nothing in the whole realm of reality which lies beyond the domain of philosophy or to which philosophical investigation does no extend." [৩২] অর্থাৎ মানব অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই, সমগ্র জগৎসত্তার মধ্যে এমন কিছু নেই, যা দর্শনরাজ্যের বাইরে পড়ে বা যার দিকে দার্শনিক অনুসন্ধান প্রসারিত হয় না।" অবশ্য একথার অর্থ এই নয় যে, দর্শন সকল প্রকারের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এবং খন্ড খন্ড

জ্ঞান দান করাই এর উদ্দেশ্য। দর্শন জগৎ-জীবন, জগৎ-জীবনের স্বরূপ ও মূল্য বিষয়ক এক সামগ্রিক আলোচনার পদ্ধতি।

ভিটগেনষ্টাইন তাঁর 'Tractatus Logico-Philosophics' গ্রন্থের 4.112 বাক্যে বলেছেন— "Philosophy aims at the logical clarification of thought, philosophy is not a body of doctrine but an activity. A philosophical work consists essentially of elucidations. Philosophy does not results in 'philosophical propositions' but rather in the clarification of propositions without philosophy thoughts are, as it were, cloudy and indistinct : its last is to make them clear and to give them sharp boundaries." অর্থাৎ "দর্শনের লক্ষ্য হল আমাদের চিন্তাকে যৌক্তিকভাবে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করা। দর্শন কোনো তত্ত্ব নয়, বরং এটি হল একটি ক্রিয়া। দর্শনশাস্ত্রের কোনো রচনা আবশ্যিকভাবে হবে এরকম কতগুলি স্পষ্টীকরণের বা বিশদীকরণের সমষ্টি। দর্শনশাস্ত্র চর্চার ফলে কতকগুলি দার্শনিক বচন পাওয়া যায়, পাওয়া যায় কতকগুলি বচনের স্পষ্টীকরণ। দর্শনচর্চর সাহায্য ছাড়া মনে হয় যেন আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলি ধোঁয়াটে এবং অস্পষ্ট। দর্শনশাস্ত্র এই চিন্তাগুলি স্পষ্ট করার কাজ শুরু করে এবং চেষ্টা করে এগুলির স্পষ্ট সীমানা নির্ধারণ করা।"

দর্শনের শাখাসমূহ (Branches of philosophy) :

দর্শন যেহেতু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আমাদের সুসংবদ্ধ সামগ্রিক জ্ঞান দান করে সেহেতু দর্শনের অসংখ্য শাখা রয়েছে। তবে আমরা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় শাখা সমূহ আলোচনা করব। দর্শনের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি দর্শন কিভাবে অন্যান্য খন্ড খন্ড শাখার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বলতে পারি দর্শনের বিষয়বস্তু অত্যন্ত বিস্তৃত এবং বহুমুখী। দর্শনের শাখাগুলিকে নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল :

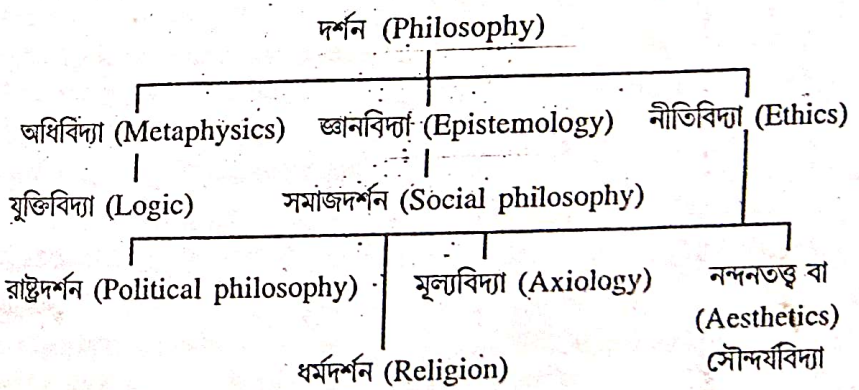

১. অধিবিদ্যা (Metaphysics) : অধিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Metaphysics। Metaphysics শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ সমন্বয়ে উৎপন্ন হয়েছে। শব্দ দুটি হল 'Meta' ও 'physika'. 'Meta' শব্দের অর্থ হল পরে (After) এবং 'physika' শব্দের অর্থ হল পদার্থবিদ্যা (physics)। সুতরাং 'Metaphysics' এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যা পদার্থবিদ্যার পরে আলোচিত হয়। পদার্থবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। আর 'Metaphysics' বা অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক জগতের সীমারেখাকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের যে প্রকৃত সত্তা রয়েছে তা জানা। যেমন, একটি কাঁচের জলপূর্ণ পাত্রে একটি সোজা লাঠিকে নিমজ্জিত করলে লাঠিটিকে বাঁকা দেখায়। এটি হল লাঠিটির অবভাসিক রূপ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবভাসিকের অন্তরালে লাঠিটির যে প্রকৃত সত্তা রয়েছে তা হল লাঠিটি সোজা। এটি হল অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। সুদূর অতীতে কোপারনিকাস এই অধিবিদ্যা দার্শনিক জ্ঞানের সাহায্যে টলেমি (ptolemy) প্রদত্ত সূর্য ঘুরছে পৃথিবী স্থির এই ধারণার পরিবর্তন করে প্রমাণ করে বলেছিলেন যে, সূর্য স্থির, পৃথিবী ঘূর্ণমান। এই ধারণাটি তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন একদিন তিনি যখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুত বেগে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন তখন লক্ষ্য করেছিলেন যে, তিনি আর তাঁর ঘোড়া দ্রুত বেগে ছুটে যাচ্ছে কিন্তু সেই গতি প্রকৃতিতে আরোপ হওয়ার ফলে লক্ষ্য করলেন যে, আসেপাশের গাছপালা ছুটছে, ঘুরছে। এর থেকে তিনি দুই বছর গবেষণা করে বর্তমানের প্রচলিত মত সূর্য স্থির পৃথিবী তার চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অধিবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি হল—দেশ, কাল, কার্য-কারণ তত্ত্ব, জড় দ্রব্য, প্রাণ, মন, আত্মা, ঈশ্বর, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কি? যদি থাকে তাহলে তার স্বরূপ কি? ঈশ্বরের সাথে আত্মা বা জগতের সম্বন্ধ কি? প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে জি.ভিসে (G.Vesey) এবং পি. ফলকেজ (P. Foulkes) বলেন, "It is a branch of enquiry that deals with fundamental questions about being (what is involved in saying that something is) and about what kinds of things there are in the world."[৩৩] এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণে উপলব্ধি করা যায় অধিবিদ্যার মৌলিক দুটি প্রশ্নের একটি সত্তা সম্পর্কিত এবং অপরটি জাগতি বস্তু সমূহের প্রকৃতি সম্পর্কিত।

প্লেটোর মতে, এই দৃশ্যমান জগৎ অতীন্দ্রিয় জগতের ছাপ বা অনুলিপি। অতীন্দ্রিয় জগৎ সনাতন ধারণার দ্বারা গঠিত হওয়ায় এই জগৎ-ই একমাত্র সত্য। এই জগতের তাত্ত্বিক জ্ঞান দেওয়াই অধিবিদ্যার কাজ। দেকার্ত তাঁর দর্শনে দ্রব্যকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করেছেন। তাই দেকার্তের দর্শনের চরম পরিণতি এই অধিবিদ্যার মধ্যে।

ব্রাডলির মতে জগৎ হল অবভাস, দেশ-কাল-দ্রব্য দিয়ে তৈরী এই জগৎ স্ববিরোধযুক্ত কিন্তু তত্ত্ব হতে গেলে যেহেতু তাকে স্ববিরোধমুক্ত হতে হবে, তাই এই জগৎ তত্ত্ব নয়।

অধিবিদ্যা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মত : অ্যারিস্টটলের মতে দর্শন ও অধিবিদ্যা অভিন্ন। এই মতটি প্লেটো, হেগেল, ব্রাডলি, আলেকজান্ডারের মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অ্যারিস্টটল অধিবিদ্যাকেই 'First philosophy' বা 'আদি দর্শন' নামে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ অ্যারিস্টটলের মতে দর্শন মূলতঃ অধিবিদ্যার সাথে অভিন্ন। কেন তিনি অধিবিদ্যাকে আদিদর্শন বা মূল দর্শন বলেন তা অধিবিদ্যার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। Metaphysics গ্রন্থের Book-IV অংশের প্রারম্ভেই অ্যারিস্টটল বলেছেন— "Metaphysics is the science of being qua being." [৩৪] অর্থাৎ যে শাস্ত্রে অস্তিত্বশীল বস্তুকে অস্তিত্বশীল বস্তু হিসাবেই আলোচনা করা হয় সেই শাস্ত্র হল অধিবিদ্যা।"

অধিবিদ্যা সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের আরও দুটি বক্তব্য আছে "Metaphysics is the science that investigates the first principles and causes."[৩৫] অর্থাৎ জগতের মূলনীতি ও কারণ সম্বন্ধে অধিবিদ্যায় আলোচনা করা হয়।" অ্যারিস্টটলের আর একটি মন্তব্য হল— "Metaphysics is the science of wisdom" [৩৬] অর্থাৎ অধিবিদ্যা হল প্রজ্ঞাশাস্ত্র।" সুতরাং তিনি অধিবিদ্যাকে যেমন "first philosophy' বা 'আদি দর্শন' বলেছেন তেমনি তাকে প্রজ্ঞা বা sophia-ও বলেছেন।

অধিবিদ্যা সম্পর্কে হিউমের মত : অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের দর্শনে অধিবিদ্যা বিষয়ে সংশয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি তাঁর 'An Enquiry Concerning Human understanding' গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদে অধিবিদ্যার প্রতি একটি তীব্র আক্রমণমূলক উক্তি করেছেন— "When we run over libraries, persuaded of these principles, what havoc must we make? If we take into our hand any volume of divinity or school metaphysics, for instance, let us ask : Does it contain any abtract reasoning concerning quality or number? No, does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence? No, commit it then to the flames : for it can contain nothing but sophistry and illusion."

হিউম তথ্যমূলক ও ধারণাগত সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান ছাড়া আর কোনো ধরণের জ্ঞান স্বীকার করেননি। আধিবিদ্যক জ্ঞান যেহেতু এই দুই ধরণের জ্ঞানের মধ্যে পড়ে না, তাই তিনি অধিবিদ্যাকে স্বীকার করেননি।

অধিবিদ্যা সম্পর্কে কান্টের মত : দার্শনিক কান্ট আধিবিদ্যক আলোচনাকে নিষ্ফল বলে মনে করেছেন। কান্টের মত, অভিজ্ঞতার জগৎকে অতিক্রম করে বস্তুস্বরূপের কোনো জ্ঞান হতে পারে না। অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে আমাদের কোনো জ্ঞান হতে পারে না, যদিও কান্ট মনে করেন যে, নিছক অভিজ্ঞতা কোনো জ্ঞান নয়। কান্টের মতে, অধিবিদ্যায় যেসব বিষয় আলোচনা করা হয় সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের কোনো জ্ঞান হতে পারে কিনা তা বিচার করা দরকার। জ্ঞান হতে গেলে জ্ঞানের বিষয়ের সংবেদন পাওয়া দরকার। কিন্তু অধিবিদ্যায় যে বস্তুরূপের আলোচনা করা হয় তা দেশ ও কালের সীমায় পাওয়া যায় না। ফলে বস্তুরূপের কোনো সংবেদন না থাকায় তার সম্পর্কে কোনো জ্ঞান লাভ করাও সম্ভব নয়। আধিবিদ্যক জ্ঞানকে কান্ট তাই অসম্ভব বলে মনে করেছেন। সুতরাং কান্টের মতে অধিবিদ্যার বিষয় যেহেতু অতীন্দ্রিয়। তাই তাদের কোনো সংবেদন হবে না। জ্ঞানের মূল উপকরণ সংবেদন না থাকায় বুদ্ধি তার আকারকে আরোপ করতে পারে না। তাই কান্টের মতে অধিবিদ্যা অসম্ভব।

হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer), হ্যামিলটন (Hamilton) প্রমুখ অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) দার্শনিকগণ মনে করেন যে, বাহ্য সত্তা বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তার আড়ালে আসল সত্তা বা অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব আছে; কিন্তু এই সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (unknown aand unknowable)। অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাই অধিবিদ্যার জগৎ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। অপরদিকে, অভিজ্ঞতাবাদী (Empricist), প্রত্যক্ষবাদী (Positivist), যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী (Logical Positivist) দার্শনিকগণ মনে করেন, অধিবিদ্যা সম্ভবপর নয়। এঁদের মতে, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মাধ্যমেই যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়। আত্মা, অতীন্দ্রিয় জগৎ, ঈশ্বর ইত্যাদি প্রত্যক্ষের বিষয় নয়; সুতরাং এগুলির অস্তিত্ব নেই। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসাবে ডেভিড হিউম এবং প্রত্যক্ষবাদী অগস্ত কোঁত (August comte)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় দর্শনে, প্রত্যক্ষবাদী চার্বাকগণও বিশ্বাস করেন যে, অতীন্দ্রিয় জগৎকে জানা যায় না। বর্তমান যুগে এয়ার (Ayer), কারনাম (Carnap) প্রমুখ যৌক্তির প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন, শাস্ত্র হিসাবে অধিবিদ্যা সম্ভব নয়। এঁদের মতে অধিবিদ্যার বাক্যগুলি (যেমন, ব্রহ্ম হয় সত্য) অর্থহীন। অধিবিদ্যার বাক্যগুলির সম্বন্ধে এঁদের বক্তব্য হল—এজাতীয় বাক্যগুলি বিশ্লেষণাত্মক নয়; আবার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই যোগ্য নয়। সেইজন্য অধিবিদ্যার বাক্যগুলি অর্থহীন। অধিবিদ্যার সাথে দর্শনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনটি মতই আলোচনা করা হল। কোনোটিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের মতে দর্শনের

অন্যতম শাখা হিসাবে অধিবিদ্যা সম্ভব। তবে অতীন্দ্রিয় সত্তা যা অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, তাকে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না। তত্ত্ব বা অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানার জন্য পথ আছে। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল মনে করেন, বুদ্ধির (Reason) সাহায্যে তত্ত্বকে জানা যায়। জার্মান দার্শনিক হেগেল মনে করেন, বিচারমূলক প্রজ্ঞার (Speculative reason) মাধ্যমে তত্ত্বকে জানা যায়। ফরাসি দার্শনিক হেনরি বার্গসোঁ মনে করেন, স্বজ্ঞার (Intuition) মাধ্যমে তত্ত্বকে জানা যায়, ভারতীয় দর্শনে অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের মতে অপরোক্ষ অনুভূতি তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত পন্থা। এই আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ ছাড়া অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানার পথ আছে। কাজেই অধিবিদ্যা অসম্ভব নয়। অধিবিদ্যা দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। তবে অধিবিদ্যাই দর্শন নয়। দর্শনের আলোচনার পরিসর অধিবিদ্যার আলোচনার পরিসরের তুলনায় বৃহত্তর। তাই অধিবিদ্যা ছাড়াও দর্শনের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা—রূপবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, আদর্শবিদ্যা, বা মূল্যবিদ্যা, নীতিবিদ্যা ইত্যাদি দেখা দিয়েছে।

২। জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) : জ্ঞানবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Epistemology, Epistemology শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ সমন্বয়ে উৎপন্ন হয়েছে। শব্দ দুটি হল 'Episteme' এবং 'logia'। Episteme' শব্দটির অর্থ হল 'জ্ঞান (knowledge) এবং 'logia' শব্দটির অর্থ হল বিদ্যা বা বিজ্ঞান (Science)। সুতরাং 'Epistemology'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিদ্যা বা বিজ্ঞান। দর্শনের যে শাখা জ্ঞানের উৎস, সীমা, বৈধতা প্রভৃতি জ্ঞান সম্পর্কীয় আলোচনা করে তাই হল জ্ঞানবিদ্যা। 'জ্ঞানবিদ্যার' মূল প্রশ্নগুলি হল জ্ঞান কি এবং জ্ঞান কি আদৌ সম্ভব? জ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয়? যথার্থ ও অযথার্থ জ্ঞান কি? এদের পার্থক্য কোথায়? যথার্থ জ্ঞানের শর্তগুলি কি কি? জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা কোথায়? জ্ঞানের সত্যতা বলতে কি বোঝায়? তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব কিনা? জ্ঞান সম্পর্কীয় এইসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা এবং তার উত্তর দানের চেষ্টাই জ্ঞানবিদ্যার লক্ষ্য।

জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সাহায্য করে। জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কে বলা হয় "Epistemology is one of the core are as of philosophy. It is concerned with the nature, sources and limits of knowledge."[৩৭] অর্থাৎ জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের মর্মবস্তু হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। কান্ট বলেছেন, দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান ও তার সমালোচনা। জ্ঞানতত্ত্বের সংজ্ঞায় আরও বলা হয়েছে— "It is the branch of philosophy concerned with the theory of knowledge. Traditionally, central issues in epistemology are the

nature and derivation of knowledge, the scope of knowledge, and the reliability of claims to knowledge."[৩৮] এই সংজ্ঞায় জ্ঞানের উৎপত্তি ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দর্শনে তিনটি মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। যথা—বুদ্ধিবাদ (Rationalism) অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) ও বিচারবাদ (criticism)।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ জ্ঞানবিদ্যার দুটি অর্থের কথা উল্লেখ করেন। একটি হল তার সংকীর্ণ অর্থ এবং অপরটি হল তার ব্যাপক অর্থ। সংকীর্ণ অর্থে, জ্ঞানবিদ্যা কেবলমাত্র জ্ঞানের বস্তুগত সত্যতা নিয়ে আলোচনা করে। এই অর্থে জ্ঞানবিদ্যা হল এক প্রকারের 'শাস্ত্র' (discipline), যার প্রধান লক্ষ্য হল বাস্তব জ্ঞান নির্ণয় করা। ব্যাপক অর্থে, জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের আকারগত ও বস্তুগত উভয়গত সত্যতা নিয়ে আলোচনা করে। এই অর্থে কেবলমাত্র বস্তুজ্ঞান নির্ধারণ করাই জ্ঞানবিদ্যার কাজ নয়, জ্ঞানের মধ্যে আকারগত সঙ্গতি অনুসন্ধান করাও জ্ঞানবিদ্যার লক্ষ্য।

জ্ঞানবিদ্যা যদিও মনোবিদ্যার যে অংশ চিন্তন নিয়ে আলোচনা করে যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'psychology of thought', সেই অংশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তবুও মনোবিদ্যার জ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং জ্ঞানবিদ্যার জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা এক নয়। মনোবিদ্যা প্রধানত ব্যক্তিমনে কিভাবে জ্ঞানের উদ্ভব (origin) ও পরিবর্ধন (development) হয়, তার বর্ণনা দেয়। এইজন্য মনোবিদ্যা জ্ঞানের বৈধতা, সীমা ও শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করে না। অপরদিকে জ্ঞান সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে জ্ঞানবিদ্যা। বস্তুত জ্ঞানবিদ্যার পরিসরকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হই (১) জ্ঞানের স্বরূপ কি? (২) জ্ঞান কিভাবে সৃষ্টি হয়? প্রথম প্রশ্নটির সমাধানে আমরা দুটি বিরোধী মতবাদ পাই : একটি হল বস্তুবাদ (Realism) এবং অপরটি হল ভাববাদ (Idealism)। বস্তুবাদ অনুসারে, বস্তুর অস্তিত্ব জ্ঞাতার উপর নির্ভর করে না। বস্তু যেভাবে বাহ্যজগতে অবস্থান করে, সেইভাবে ব্যক্তিজ্ঞানে ধরা পড়ে। অর্থাৎ বস্তুবাদ জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু ভাববাদ অনুসারে জ্ঞান হল আভ্যন্তরীণ মানসিক প্রক্রিয়া (Internal mental process)। কাজেই জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাতার মনের উপর নির্ভরশীল।

ফিক্‌টে (Fichte-এর মতে, "দর্শন হল জ্ঞান সম্পর্কীয় বিজ্ঞান" (Philosophy is the science of knowledge)। লকের (Lock) মতে জ্ঞান হল বিভিন্ন ধারণার মধ্যে মিল বা অমিল প্রত্যক্ষ করা।

নব্যবস্তুবাদী সম্প্রদায় মনে করেন জ্ঞানতত্ত্ব অধিবিদ্যাবিষয়ক প্রশ্নের সদুত্তর দিতে

পারে না। কারণ অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা তার জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ আল আমাদের চেতনাই এই বিষয়গুলিকে সরাসরি জানতে পারে। তাঁদের মত মে নেওয়া যায় না। আবার কান্ট ও ফিক্‌টের মতও গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু দ ও জ্ঞানতত্ত্ব এক নয়। জ্ঞানবিদ্যা দর্শনের একটি শাখামাত্র। জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে সু ধারণা থাকলে তবেই অধিবিদ্যার কাজ আরম্ভ করা যায়। পরমতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে জ সম্ভভ কিনা তা জ্ঞানবিদ্যার কাছে জেনেই তবে অধিবিদ্যার কাজ আরম্ভ করা যা কাজেই দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানবিদ্যা হল সেই শাস্ত্র, যা পাঠ করলে জ্ঞানের উৎস, সী শর্ত, স্বরূপ, উপকরণ, মানদন্ড, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা যা

দর্শন চায় জগৎ, জীবন ও আমাদের অভিজ্ঞতার সামগ্রিক ব্যাখ্যা ও মূল্যা করতে। জ্ঞানবিদ্যার সাহায্যে দর্শন জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করে পারে। জ্ঞানবিদ্যা ছাড়া দর্শন সম্ভব নয়। লকই সর্বপ্রথম একথা উপলব্ধি করেছিলে যে, তত্ত্ব আলোচনার আগে আমাদের দেখা দরকার তত্ত্বকে জানার মত সাম আমাদের কতটুকু আছে। তাই ঐতিহাসিকভাবে দর্শনের জন্ম আগে হলে যৌক্তিকভাবে দর্শনের আলোচনা করার আগে জ্ঞানবিদ্যার প্রয়োজন।

৩. নীতিবিদ্যা (Ethics) : 'নীতিবিদ্যা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Ethics' 'Ethics' শব্দটি এসেছে 'Ethos' শব্দ থেকে। যার অর্থ হল চরিত্র। Ethics আবা Moral philosophy নামেও পরিচিত। ল্যাটিন শব্দ 'Mores' কথাটি থেকে 'Moral' কথাটি এসেছে, যার অর্থ রীতিনীতি। মানুষ অভ্যাসের মাধ্যমে রীতিনীতি আয়ত্ব করে। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, নীতিবিদ্যা হল মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় বিদ্যা। অনেক নীতিবিজ্ঞানী মনে করেন, মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্য-ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি ধারণার বিচারের জন্য নৈতিক (পরমকল্যাণ ও পরমার্থ) আদর্শের প্রয়োজন। এই আদর্শের সাহায্যে আমরা দৈনন্দিন আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি। সুতরাং নীতিবিদ্যার লক্ষ্য হল পরমার্থের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জি (Mackenzie) নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন— "Ethics may be defined as the study of what is right and good in conduct."[৩৯] অর্থাৎ "নীতিবিজ্ঞান হল এমন এক বিদ্যা, যা মানুষের আচরণের ঔচিত্য বা মঙ্গলের কথা আলোচনা করে।" এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, মানুষের সব আচরণের নৈতিক বিচার সম্ভব নয়। কেবলমাত্র ঐচ্ছিক ক্রিয়ার (Valuntary action) নৈতিক বিচার সম্ভব। ঐচ্ছিক ক্রিয়া কাকে বলে জানা দরকার। পূর্ব থেকে সংকল্প করে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী যে কাজ করা হয় তাকে বলে ঐচ্ছিক ক্রিয়া। নীতিবিজ্ঞান ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল্য বিচার করে। অর্থাৎ কাজটি 'ভালো' না 'মন্দ', 'ন্যায়' না 'অন্যায়' তা নির্ধারণ করে।

Lillie নীতিবিদ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—নীতিবিদ্যা হল সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যেখানে মানুষের আচরণ ন্যায় কিংবা অন্যায় ভালো কিংবা মন্দ কিংবা অনুরূপ কোনোভাবে অভিহিত হওয়ার যোগ্য কিনা তা বিচার করে।"[৪০]

Lillie আরও বলেছেন,— "This just the kind of question with which ethics deals-what is the true meaning of such words as 'good' and 'right' and 'ougt' which are used to commonly in everyday conversation."[৪১]

নীতিবিদ্যাকে মানবজীবনের পরমার্থ সম্পর্কীয় বিজ্ঞানও বলা হয়। মানুষের সৎ আচরণের সাথে কল্যাণের ধারণা জড়িত, আবার অসৎ আচরণের সাথে অকল্যাণের ধারণা জড়িত। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কল্যাণ কি? অকল্যাণই বা কি? কল্যাণের আদর্শ নির্ণয় করা সম্ভব হলে তবেই মানুষের আচরণ কল্যাণকর না অকল্যাণকর তা নির্ণয় করা সম্ভব হবে। এই কারণেই নীতিবিদ্যাকে মানব জীবনের সম্পর্কীয় বিজ্ঞান বলা হয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে কোনো না কোনো আদর্শ থাকে। আমরা যখন কোনো আচরণের ভালোত্ব, মন্দত্ব বিচার করি, তখন একটি মানদন্ডের ভিত্তিতেই এই ধরণের মূল্যায়ন করি। এই মানদন্ড বা আদর্শ মানবজীবনের অন্তর্নিহিত আদর্শ। সেই কারণে ম্যাকেঞ্জি বলেছেন, "Ethics is the science or general study of the involved in human life."[৪২] অর্থাৎ "নীতিবিদ্যাকে মানব জীবনের অন্তরস্থ আদর্শের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা বললে অত্যুক্তি হবে না।" এক কথায় বলা যায় 'Ethics' বা 'নীতিবিদ্যা' আমাদের এইসব ভালো-মন্দের নৈতিক প্রত্যয়গুলির বিশ্লেষণপূর্বক তাদের সঠিক ও সুস্পষ্ট অর্থ নির্ধারণ করতে চায়। পাশ্চাত্যে নীতিবিদ্যা দর্শনের একটি শাখারূপে স্বীকৃত। plato, Aristotle থেকে শুরু করে J.S. Mill, Kant, Mackenzie প্রভৃতি আধুনিক যুগের দার্শনিকরা নীতিবিদ্যার সমস্যা নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন।

মানুষ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। তাই একমাত্র মানুষই নৈতিক জীবনযাপন করে। নৈতিকতা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে বলেই আমরা ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, আদর্শ বা মূল্যবোধ প্রভৃতি কথাগুলি ব্যবহার করি। আদর্শ বা মূল্যবোধের ধারণা মানুষের মধ্যে কবে থেকে জাগরিত হয়েছে তা বলা সম্ভব নয়। অনেকের মতে, আদর্শ বা মূল্যবোধের ধারণা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। এই সকল প্রত্যয়গুলির দ্বারা আমরা জীবনকে পরিচালিত করি। আমরা অনেক সময় বলি, 'এরূপ কাজ করা উচিত নয়, 'সর্বদা সৎ পথে চলা উচিত, 'অপরের সাহায্য

করা ভালো' ইত্যাদি। প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা 'উচিৎ-অনুচিৎ', 'ভালো-মন্দ' কথাগুলি ব্যবহার করছি। কিন্তু অনেক সময় কোনো এক ব্যক্তির যে কাজকে আমরা ভালো বলি, অপর এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সেই কাজকেই মন্দ বলতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগরিত হয়, 'ভালো-মন্দ', 'উচিৎ-অনুচিৎ' কথাগুলির প্রকৃত অর্থ কি? এই সব প্রশ্ন নিয়ে যেখানে আলোচনা করা হয় সেই শাস্ত্রের নামই নীতিবিদ্যা।

দর্শনের আলোচনার পরিসর খুব ব্যাপক। আমাদের অভিজ্ঞতার এমন কোনো দিক নেই যা দর্শনের আলোচনার আওতায় পড়ে না। দর্শনের লক্ষ্য হল জানা-জগৎকে ও জীবনকে জানা। জানতে গেলেই দর্শনের পক্ষে মূল্যের আলোচনাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তার কারণ, মানুষ হিসাবে আমরা মূল্যের সন্ধানে ব্রতী হই। দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল মূল্যবিদ্যা বা আদর্শবিদ্যা যা মূল্য বা আদর্শ সক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে। মূল্যবিদ্যা বা আদর্শবিদ্যা সত্য, শিব ও সুন্দরের পরম আদর্শগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে। সত্য, শিব ও সুন্দর এই তিনটি পরমমূল্যের মধ্যে শিব বা মঙ্গলের আলোচনাই নীতিবিদ্যা করে থাকে। মানুষের আচরণ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কোন্ আচরণ দ্বারা পরম কল্যাণ বা পরম মঙ্গল সাধিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের জানা উচিত পরম মঙ্গলের (Supreme Good) স্বরূপটি কি? নীতিবিদ্যা পরম মঙ্গলের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করতে চায়। নীতিবিদ্যার চরম লক্ষ্য হল এই শিব বা মঙ্গলের প্রকৃত স্বরূপটি জানা। যেদিন আমরা তা জানতে পারব, সেদিন নীতিবিদ্যা তার চরম লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

৪। **যুক্তিবিদ্যা বা তর্কবিদ্যা (Logic) :** বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) হলেন যুক্তিবিজ্ঞানের প্রবক্তা। যুক্তিবিদ্যা বা তর্কবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'Logic' এই 'Logic' শব্দের উৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'Logike' থেকে। গ্রীক ভাষায় 'Logike' হল 'Logos' শব্দের বিশেষণ এবং 'logos' ল্যাটিন শব্দের অর্থ হল চিন্তা। আর চিন্তার বাহন হল ভাষা। সুতরাং চিন্তা ও ভাষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। যদিও চিন্তা ও ভাষা এক নয়। অতএব, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'যুক্তিবিদ্যা' বা 'Logic' হল ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

যুক্তিবিদ্যা হল ভাষায় প্রকাশিত অনুমান। যুক্তি হল দুই বা ততোধিক বচনের সমষ্টি। যেখানে একটি বচন সিদ্ধান্ত হিসাবে এক বা একাধিক বচন থেকে নিঃসৃত হয়। প্রখ্যাত যুক্তিবিদ Irving Marmer Copi তাঁর 'Symbolic Logic' গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন— "The study of Logic, is the study of the

methods and principles used in distinguishing correct (good) from incorrect (bad) arguments.".[৪৩] অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা পাঠ হল শুদ্ধ বা ভালো যুক্তি থেকে অশুদ্ধ বা মন্দ যুক্তিকে পৃথক করার জন্য যেসব পদ্ধতি ও নিয়মাবলী ব্যবহার করা হয়, সেইসব পদ্ধতি ও নিয়মাবলীর আলোচনা। এছাড়াও তিনি (I.M. Copi) তাঁর 'Introduction to Logic' গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যার অনুরূপ অপর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন— "Logic is the study of the methods and principles used to distinguish good (correct) from bad (incorrect) reasoning"[৪৪] অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা পাঠ হল মন্দ বা অশুদ্ধ যুক্তি থেকে ভালো বা শুদ্ধ যুক্তি পৃথক করার পদ্ধতি ও নীতিসমূহের অনুশীলন। যুক্তি হল এমন বচন সমষ্টি বা বচন গুচ্ছ যার অন্তর্ভুক্ত একটি বচনের সত্যতা অন্য একটি বচনের বা একাধিক বচনের সত্যতার উপর নির্ভর করে বলে দাবী করা হয়।— "An argument is any group of proposition of which one is claimed to follow from the others, which are regarded as providing evidence for the truth of that one." উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—

সকল দার্শনিক হয় ভাবুক।
সকল কবি হয় ভাবুক।
সুতরাং সকল কবি হয় দার্শনিক।

এটি একটি যুক্তি। এক্ষেত্রে 'সকল দার্শনিক হয় ভাবুক', 'সকল কবি হয় ভাবুক' এবং 'সকল কবি হয় দার্শনিক' এদের প্রত্যেকটি এক একটি বচন। উক্ত তিনটি বচনের মধ্যে শেষের বচনটিকে অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বচনটিকে প্রথম দুটি বচনের অর্থাৎ প্রধান আশ্রয়বাক্য বা সাধ্যবাক্য, অপ্রধান আশ্রয়বাক্য বা পক্ষবাক্যের নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই শেষের বচনটি প্রথম দুটি বচন থেকে নিঃসৃত। এই বচন সমষ্টিতে দাবী করা হয় যে, 'সকল কবি হয় দার্শনিক' এই বচনটি সত্য। কেননা প্রথম বচন দুটি সত্য। যদিও যুক্তিটি অব্যাপ্য হেতু দোষে দুষ্ট। এভাবে প্রতিটি যুক্তিতে এক বা একাধিক বচনের সত্যতার ভিত্তিতে দাবী করা হয় যে, তার বা তাদের দ্বারা সমর্থিত অন্য একটি বচন সত্য হবে।

রাসেলের মতে, "যুক্তিবিদ্যা হল দর্শনের সারবস্তু" (Logic is the Essence of philosophy)। জন স্টুয়ার্ট মিল (J.S. Mill) তাঁর 'System of Logic' গ্রন্থে যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দিয়েছেন— "Logic is the science of the operations of understanding subservient to the estimation of evidence." অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা হল চিন্তার অন্তঃস্থিত প্রক্রিয়া সমূহের প্রমাণগত ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।

সিমন ব্লাকবার্ণ যুক্তিবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলেছেন— "Logic is the gene science of inference, deductive logic, in which a conclusion follo from a set of premises, is distinguished from inductive logic, wh studies the way in which premises may support a conclusi without entailing it."[৪৫] অর্থাৎ যুক্তিবিজ্ঞান অনুমানের বিজ্ঞান, যার দ্বারা জানা সত্য থেকে অন্য এক অজানা সত্যে উপনীত হওয়া যায়। অবরোহ যুক্তিবিজ্ঞ নির্বিশেষে সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া যায়। আর আরোহ যুক্তিবিজ্ঞা বিশেষ সত্য থেকে নির্বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া যায়।

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যুক্তিবিদ্যা অনুমান বা যুক্তিবিদ্যা ছাড় অনুমানলব্ধ জ্ঞানের বৈধতা বিচারের জন্য কতগুলি নিয়ামক বিধি প্রণয়ন করে এইজন্য যুক্তিবিদ্যা চিন্তার কতগুলি মূলসূত্র (Fundamental laws of though বিনা প্রমাণে মেনে নেয়। যেমন তাদাত্ম্য নিয়ম (Low of Identity), বিরোধবাধ নিয়ম (law of contradiction) ইত্যাদি। তাছাড়া, অনুমান পদ্ধতির অঙ্গ উপাদান হিসাবে সামান্য ধারণা (concept), পদ (Term), বচন (Proposition অবধারণ (Judgement) প্রভৃতি নিয়েও যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে। উপর যুক্তিবিদ্যা তর্কপদ্ধতির সহায়ক কতগুলি আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা করে যেমন সংজ্ঞার্থ (Definition), বিভাজন (Division), শ্রেণীকরণ (Classifica tion), নামকরণ (Naming) প্রভৃতি।

দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দর্শনের লক্ষ্য হল বিশ্বের সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করা। দার্শনিক এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে জগৎ ও জীবনের উপলব্ধি করতে চান এবং তার অর্থ ও মূল্য নির্ণয় করতে চান। সেইজন্য দার্শনিককে স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে হয়। সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে গেলেই দার্শনিককে যুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নিতে হয়। কারণ, কিভাবে চিন্তা করলে আমরা নির্ভুলভাবে বা সুশৃঙ্খলভাবে চিন্তা করতে পারব, যুক্তিবিদ্যা তা শেখায়। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বিশেষ দার্শনিক সিদ্ধান্ত স্বীকার করতে না চান, তখন যুক্তিবিদ্যার সহায়তায় আমরা তার অভিযোগ খন্ডন করতে পারি। সেইজন্য বলা হয় যুক্তিবিদ্যা হল দর্শনের ভিত্তি। আবার যুক্তিবিদ্যাও দর্শনের উপর নির্ভরশীল। যুক্তিবিদ্যা গোড়াতেই কতগুলি চিন্তার মূলসূত্র বিনা বিচারে মেনে নেয়। এইগুলির যথার্থ নির্ণয় করে দর্শন। তাছাড়া যে সত্য যুক্তিবিদ্যা নিরূপণ করে তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা অর্থাৎ তা প্রকৃতই সত্য না অলীক, তা নির্ধারণ করে দর্শন।

জার্মান দার্শনিক হেগেল মনে করেন, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন মূলত অভিন্ন। যুক্তিবিদ্যা

চিন্তা (thought) সম্পর্কীয় বিদ্যা, দর্শন তত্ত্ব বা সত্তা (reality) সম্পর্কীয় বিদ্যা। হেগেলের মতে চিন্তার ক্ষেত্রে যে সত্য দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিকাশ লাভ করে, সেই সত্যই জগতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে প্রকাশিত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের মন ও বাহ্যজগৎ এক মৌল চিৎশক্তির (Absolute Idea) প্রকাশ, সে কারণে মূলত উভয়ই অভিন্ন। মানুষের মন ও বাহ্যজগৎ একই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। তাই হেগেল মনে করেন, তর্কবিদ্যার নিয়ম জানলে বিশ্বজগতেরও নিয়ম জানা যায়। এই প্রসঙ্গে হেগেলের সুবিখ্যাত উক্তি হল—"যা সত্তা তাই যুক্তিসঙ্গত, যা যুক্তিসঙ্গত তাই সত্তা" (What is real is rational and what is rational is real)। সেইজন্য হেগেলের মতে চূড়ান্ত দৃষ্টিতে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা অভিন্ন।

অধিকাংশ দার্শনিকদের কাছে হেগেলের উপরোক্ত মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা বলেন, যুক্তিবিদ্যা কেবলমাত্র সত্যের স্বরূপ ও সত্য লাভ করার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করে। দর্শনের লক্ষ্য বিশ্বের সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করা। সেইজন্য দার্শনিক যুক্তিবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। দার্শনিক শুধু সত্যের আদর্শ অনুসরণ করেই তৃপ্ত হন না। তিনি 'শিব' এবং 'সুন্দর' এর আদর্শও অনুসরণ করতে চান। এই কারণে একজন তর্কবিদ্ হলেন সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক। কাজেই দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে যুক্তিবিদ্যা দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

সমাজ দর্শন (Social philosophy) :

মানবজীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মানুষের সামাজিক চরিত্র। 'মানুষ সামাজিক জীব।' অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই মানুষ পরস্পরের সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। বস্তুত প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে সমাজের মধ্যেই বসবাস করতে হয়। সমাজের মধ্যে মানুষের আচার আচরণ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় মূলত দুটি শক্তির দ্বারা। এই দুটি শক্তির একটি হল প্রাকৃতিক এবং অপরটি সামাজিক। প্রাকৃতিক শক্তিকে জানা ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে আগে। সমাজ ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কেও মানুষের চিন্তা ভাবনার সূত্রপাত ঘটেছে সুপ্রাচীনকালে। কিন্তু প্রাচীনকালে মানুষ শুধু সমাজকে নিয়েই ভাবনা চিন্তা শুরু করেনি। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে সে এই সময় অনুসন্ধান চালিয়েছে এবং এই অনুসন্ধানের ফল হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞান।

'সমাজদর্শন' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে দুটি শব্দের সমাহারে। এই দুটি শব্দ হল 'সমাজ' ও 'দর্শন'। আক্ষরিক দিক থেকে বিচার করলে আদর্শ ও মূল্যমানের সামগ্রিক

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক ঘটনাসমূহের বিচার বিশ্লেষণই হল সমাজদর্শন। সমাজ সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনাই হল সমাজদর্শন। সমাজ হল সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন জনগোষ্ঠী। সমাজ বলতে বোঝায় মোটামুটিভাবে স্থায়ী একটি সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে। সামাজিক সম্পর্কের বন্ধনে সমাজের সদস্যরা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। সমাজের সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সচেতনতা থাকে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, আবার বিবাদের মনোভাবও থাকে। কিন্তু স্বার্থের অভিন্নতা বোধের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক সম্পর্ক বন্ধনের সৃষ্টি হয়। এটি হল 'সমাজ' সম্পর্কিত ধারণা। অপরদিকে মানবীয় অভিজ্ঞতার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার বিশ্লেষণই হল 'দর্শন'।

সমাজদর্শন সমাজ বিজ্ঞানের নিকট থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করে তাদের প্রকৃত মূল্য অসাধারণ এবং বিশ্ব সত্তার মধ্যে তাদের স্থান নির্ধারণ করে থাকে। তাই গিসবার্ট যথার্থই বলেছেন—"সমাজদর্শন হল সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনস্থল" ("Social philosophy is the meeting point of sociology and philosophy")। সমাজবিজ্ঞান সমাজ জীবনের যে সকল তথ্য আবিষ্কার করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমাজদর্শন সেগুলির সম্যক মূল্যায়ন করে, এবং সেগুলিকে মূল নীতি বা আদর্শের অন্তর্গত করে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করার চেষ্টা করে। তাই সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকেঞ্জি বলেন— "Social philosophy in particular concentrates its attention on the social unity of mankind, and seeks to interpret the significance of the special aspects of human life with reference to that unity."[৪৬] অর্থাৎ সমাজদর্শন মানবজাতির সামাজিক ঐক্যের দিকে মনোনিবেশ করে এবং এই ঐক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে থাকে। এই প্রসঙ্গে গিসবার্ট বলেন— "Its role in the social sciences is the study of the fundamental principles and concepts of social life in their epistemological and axiological aspects with a view to elaborate the higher synthesis of the social sciences and to define their place in the universe."[৪৭] অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের উচ্চতর সমন্বয় ও সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্থান প্রদর্শনের জন্য সমাজদর্শন সামাজিক জীবনের মৌলিক নীতি এবং প্রত্যয়গুলিকে জ্ঞানের এবং মূল্যের দিক দিয়ে আলোচনা করে।

গিনস্‌বার্গ (Ginsberg)-ও বিশ্বাস করেন যে, সমাজদর্শনের দুটি দিক আছে একটি হল সমালোচনামূলক বা বিচারমূলক (Critical or logical) এবং অপরটি হল গঠনমূলক বা সংশ্লেষণমূলক (Constructive or synthetic)। সমালোচনামূলক

বা বিচারমূলক দিক থেকে সমাজদর্শন বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের মূল ধারনাগুলির প্রকৃত অর্থ কি? তারা যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ কিনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এই দিক থেকে সমাজদর্শন বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান যে পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করে তার যথার্থ (validity) নির্ধারণ করে এবং যেসব মূল নীতিতে তারা বিশ্বাস করে, সেইসব পূর্বস্বীকৃতির বৈধতা, অর্থাৎ কতখানি সেগুলি গ্রহণযোগ্য আর কতখানি অগ্রাহ্য তা নির্ণয়ের চেষ্টা করে। কিন্তু সমাজদর্শন শুধু সমালোচনামূলক নয়, তার একটা গঠনমূলক দিকও আছে। গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজদর্শন বিভিন্ন সামাজিক আচার ব্যবহার, সংস্থা ও আদর্শের মূল্য নির্ধারণ করে এবং ব্যক্তি তথা সমাজের কল্যাণের জন্য কি আদর্শ হওয়া উচিত, তা নির্ণয় করার চেষ্টা করে। আদর্শ সমাজ কেমন হবে তা নির্ধারণ করে সমাজদর্শন। দর্শনে যে 'সত্যম, শিবম ও সুন্দরম' এর তত্ত্ব আলোচনা রয়েছে তার আলোকে সমাজ আদর্শ ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক ব্যবহারগত আদর্শ কি হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় দিক্‌দর্শন স্থাপন করে সমাজদর্শন। এই প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী হবহাউস (Hobhouse) তাঁর 'Elements of social justice' গ্রন্থে বলেন— "A conception of the harmonious fulfilment of human capacity as the substance of happy life."[৪৮] অর্থাৎ সমাজদর্শন শান্তিপূর্ণ জীবনের স্বার্থে ব্যক্তিবর্গের ক্ষমতার সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিপূর্ণতার ধারণাকে তুলে ধরে এবং তা অর্জনের উপায় পদ্ধতির অনুসন্ধান করে।

পরিশেষে, সমাজদর্শনের প্রকৃতি সম্পর্কে বলা যায় যে, কিভাবে আদর্শ জীবনযাপন করা যায়, কি উপায়ে সমাজের ঐক্য এবং শান্তির প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিভাবে সমাজের উন্নতি সাধন করা যায়—সমাজদর্শন সেই সম্বন্ধে পথনির্দেশ করে। সমাজদর্শন হল সামাজিক মূল্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের আলোচনা। সমাজ জীবনে কি ছিল, কি আছে বা কি হতে পারে তার আলোচনা অপেক্ষা এভাবে থাকার সার্থকতা ও তার মূল্য বিচার করাই সমাজ দর্শনের প্রধান কাজ। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেগেল, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ সমাজদার্শনিক সমাজ জীবনের একটি সামগ্রিক আদর্শ নিরূপণ করেছেন এবং সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। এইভাবে তাঁরা সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন ও উন্নতি বিধানের পথকে প্রশস্ত করেছেন। সামাজিক আদর্শের ভিত্তিতে সমাজের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। তার জন্য সমাজদর্শনের পঠন পাঠন প্রয়োজন। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে চরম তত্ত্বের মানদন্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সামাজিক ঘটনাসমূহের মূল পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই মানদন্ডের সহায়ক ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে বা ফলাফলের মধ্যে সমন্বয় সাধন বা মূলগত ঐক্য বিধান আবশ্যক। সমাজদর্শনই এই

দায়িত্ব পালন করে। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির উদারতা ও নিরপেক্ষতা আবশ্যক। সমাজদর্শনই জ্ঞানচর্চার দৃষ্টিভঙ্গিকে নিরপেক্ষ ও উদার করে। সুতরাং সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারায় সমাজদর্শনের উপযোগিতা অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্রদর্শন (Political philosophy) :

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন সময়ে লেখকগণ আলোচ্য শাস্ত্রটিকে কখনও 'রাষ্ট্রনীতি' (Politics), কখনও 'রাষ্ট্রদর্শন' (Political philosophy), কখনও 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' (Political theory), আবার কখনও 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' (Political science) এইসব নামে অভিহিত করেছেন। এইসব পারিভাষিক শব্দের বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রের পরিধি সম্পর্কে বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। ইউরোপীয় সাংবাদিক তথা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেলিনেক (Jellinek)-এর মতানুসারে, "অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের তুলনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সঠিক নামকরণের সমস্যা অধিক" ("There is no science which is so much in need of a good terminology as is political science")।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অনেকে 'রাষ্ট্রদর্শন' (Political philosophy) নামে অভিহিত করে থাকেন। তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রের দার্শনিক তাৎপর্য বিশ্লেষণই হল রাষ্ট্রদর্শনের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক জীবনের ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কে কোনো আলোচনা এই শাস্ত্রে থাকে না। রাষ্ট্রের উদ্ভব, বিবর্তন, প্রকৃতি, কার্যাবলী, সংগঠন, রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য প্রভৃতি তত্ত্বগত আলোচনার মধ্যেই রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনা সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক সংগঠন, তাদের কার্যাবলী, কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় এর এক্তিয়ারের বাইরে। বস্তুত রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনা ভাবভিত্তিক। রাষ্ট্রের ব্যবহারিক আলোচনা রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত হয় না। রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনায় ঔচিত্য—অনৌচিত্যের নীতিমূলক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। রাষ্ট্রের প্রকৃতির ভালোমন্দের দিক, রাষ্ট্রের কি করা উচিত, কি করা উচিৎ নয়, নীতিশাস্ত্রের মতো এইরকম নির্দেশমূলক বিষয়ও রাষ্ট্রদর্শনে বর্তমান থাকে।

রাষ্ট্রদর্শনের লক্ষ্য হল একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করা। অর্থাৎ রাজনৈতিক দর্শন কেবল তথ্য নিয়েই আলোচনা করে না, কিভাবে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় সে নিয়েও আলোচনা করে। যেমন প্লেটো (Plato) তাঁর 'Republic' গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য দার্শনিক রাজার অনুসন্ধান করেছেন। আবার রুশো তাঁর আদর্শ সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সর্বশক্তিমান সাধারণ ইচ্ছা (general will) কে দাড় করিয়েছেন। সুতরাং রাজনৈতিক দর্শনের একটি ব্যবহারিক দিকও আছে। রাজনৈতিক দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হল রাজনৈতিক জীবন

সম্পর্কে একটি সার্বিক তত্ত্ব বের করা। প্লেটোর 'Republic' এবং 'Laws', অ্যারিস্টটলের 'Politics' এবং 'Ethics',হবস্-এর 'Leviathan', লকের 'Two Treaties of civil government', হেগেলের 'Philosophy of Right', কান্টের 'Science of Right', কার্ল মার্কসের 'The communist Manifesto' ইত্যাদি গ্রন্থকে রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে চিরায়ত ও কালজয়ী গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

দর্শনের কাজ হল বিশ্বাসের মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ের স্পষ্টীকরণ। রাষ্ট্রদর্শন এই পদ্ধতিতেই প্রচলিত রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা সমূহকে ন্যায় অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ, ইত্যাদি সম্বন্ধীয় প্রচলিত মতবাদ বা বিশ্বাসগুলি বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় কতখানি প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর তার বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে। কেননা সমাজ, কর্তৃত্ব, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলির অর্থ স্পষ্ট না হলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন হয় এইসব বিষয়গুলির আলোচনা ও অর্থ বিশ্লেষণ। সুতরাং রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রের প্রচলিত বিশ্বাসের মূল্যায়ন এবং সেই প্রসঙ্গে তাদের অর্থ বিশ্লেষণ করা হয়। প্রচলিত মতে, রাষ্ট্রদর্শন আদর্শনিষ্ঠ আলোচনা। কারণ, রাষ্ট্রদর্শনে কোনো একটি মানদন্ড বা আদর্শের ভিত্তিতে মানুষের রাজনৈতিক জীবনের তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল্যায়ন করা হয়। অধ্যাপক র‍্যাফেল বলেন, রাষ্ট্রদর্শন রাজনৈতিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়গুলির বিচার বিশ্লেষণপূর্বক মূল্যায়ন করে বলেই রাষ্ট্রদর্শনও আদর্শনিষ্ঠ আলেচনা। রাষ্ট্রদর্শন যখন কোনো রাজনৈতিক বিশ্বাসের যৌক্তিকতা বিচার করে, তা উচিত না অনুচিত তা বলে, তখনই তার মূল্যায়ন বলতে বোঝায় আদর্শনিষ্ঠ আলোচনা। তাই আদর্শনিষ্ঠ আলোচনা অর্থে যখন 'বিচার বিশ্লেষণ নয়' এমন কোনো আদর্শের প্রেক্ষিতে বিশ্বাসের মূল্যায়ন করা হয় তখন বিজ্ঞানের মতো একে আদর্শনিষ্ঠ আলোচনা বলা যাবে না। তাই রাষ্ট্রদর্শন 'আদর্শনিষ্ঠ' আলোচনা কিনা তা নির্ভর করে শব্দটিকে কোন্ অর্থে গ্রহণ করা হবে তার উপর। বিচার বিশ্লেষণপূর্বক বিশ্বাসের মূল্যায়ন অর্থে গ্রহণ করা হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আদর্শনিষ্ঠ আলোচনা বলা যায়।

রাষ্ট্রদর্শন মূলত দর্শন। দর্শন যেমন সমগ্র বিশ্বের মূল সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে প্রকাশিত জগতের ব্যাখ্যা দান করে এবং বিভিন্ন ঘটনার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত মূলগত ঐক্যের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করে, রাষ্ট্রদর্শন তেমনি বৃহত্তর সমাজ দর্শনের অঙ্গ হিসাবে সমগ্র রাষ্ট্র সম্বন্ধে তত্ত্বমূলক আলোচনা করে থাকে। রাজনীতিবিদরা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাষ্ট্রের যাবতীয় ঘটনার বিচার করে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্ব বা নীতির সাথে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সম্পর্ক নিরূপণ করে।

রাষ্ট্রদর্শন সমাজদর্শনের প্রকারভেদ হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান যথা—ধনবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, ইতিহাস, পরিসংখ্যান প্রভৃতি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলিকে মূলনীতির অন্তর্গত করে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে এবং এইসব বিজ্ঞানের স্বীকৃতি মৌলিক নীতি ও ধারণাগুলিকে চরম তত্ত্বের মানদন্ডে বিচার করে মূল্য অবধারণ করে এবং আদর্শ রাষ্ট্রের একটি সামগ্রিক পরিচয় দান করে।

জ্ঞানের দিক থেকে রাষ্ট্রদর্শনের তিন প্রকার কাজ রয়েছে। যথা—(১) তত্ত্বমূলক, (২) সমালোচনামূলক, ও (৩) সমন্বয়মূলক। রাষ্ট্রীয় জীবনের মৌলিক ধারণা ও নীতিসমূহ আলোচনা করা রাজনৈতিক দর্শনের তত্ত্বমূলক কাজ। সামাজিক বিজ্ঞানগুলির স্বীকার্য প্রত্যয়, নীতি ও সিদ্ধান্ত সমূহের সত্যতা ও উৎকর্ষতা বিচার করা এই দর্শনের সমালোচনামূলক কাজ। আর বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সমন্বয়মূলক কাজ।

মূলত রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয় হল রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূল কারণ এবং তার ক্রমবিকাশের চরম উদ্দেশ্য ও আদর্শ নির্ধারণ, নাগরিক জীবনের কর্তব্য ও অধিকার এবং আচার ও অনুষ্ঠানের দার্শনিক ভিত্তি ও মূল্য নিরূপণ, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে পরম তত্ত্বের ভিত্তিতে সম্পর্কের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং কি কি উপায়ে রাষ্ট্রের তথা সমাজের অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধন সম্ভবপর তার নির্দেশ দান। পরিশেষে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু যেমন রাষ্ট্রদর্শনে বিবেচিত হয় তেমনি জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি বহু বিষয় রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। জীববিদ্যার বিষয়বস্তু জীবন ও তার ক্রমবিকাশ রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। মনোবিজ্ঞানের কতগুলি বিষয় রাষ্ট্রদর্শনের আলোচনার অঙ্গ। কারণ, মনোবিজ্ঞানের মতো রাষ্ট্রদর্শনও মুখ্যত মন নিয়ে আলোচনা করে। যে উৎস থেকে পরিবার, সংঘ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা হল মানুষের মন। মানুষের আশা আকাঙ্খা ভাবধারা আদর্শের অনুপ্রেরণা ইত্যাদি। এই হিসাবে মানুষের মনের স্বরূপ আলোচনা রাষ্ট্রদর্শনের অপরিহার্য। যেসব মানসিক কারণে সমাজ তথা রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয় সেইসব মনোবৃত্তিই এই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। অনুরূপভাবে নীতিবিদ্যার সাথে রাষ্ট্রদর্শনের সম্পর্ক এত নিবিড় যে নীতিবিদ্যার বহু বিষয় যথা—উদ্দেশ্য, কল্যাণবাদ, অধিকার ও কর্তব্য, অপরাধ ও শাস্তি, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। নীতিবিদ্যা রাষ্ট্রদর্শন উভয়ই সমাজস্থিত মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ এবং ব্যক্তির আচরণের মূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করে বলে উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ।

ধর্মদর্শন (Religion) :

ধর্মদর্শনের ইংরেজি হল 'Philosophy of Religion'। সুতরাং ধর্মদর্শন দুটি ইংরেজি শব্দ 'Philosophy' ও 'Religion' থেকে এসেছে। আবার 'Philosophy' শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ 'Philos' ও 'Sophia' থেকে উদ্ভূত। 'Philos' শব্দের অর্থ অনুরাগ (Love) আর 'Sophia' শব্দের অর্থ জ্ঞান (Wisdom/Knowledge)। সুতরাং philosophy শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ' (Love of wisdom)। আর ওয়েবস্টারের অভিধান অনুসারে ইংরেজি 'Religion' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে 'Religare' শব্দ থেকে। যার অর্থ হল বন্ধন (Bond) বা যা দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখে। সুতরাং নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ (Taboo or Restraint) হল শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ। ল্যাকটেনটিয়াস (Lactantius)-ও মনে করেন যে, Religion' শব্দটি 'Religare' শব্দ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু তিনি বন্ধন বলতে কোনো নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ বোঝেননি। তিনি বন্ধন বলতে মনে করেন, সদর্থক বা ইতিবাচক কিছু, অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে বন্ধন বা ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু সিসেরো (Cicero) মনে করেন, 'Religion' শব্দটি 'Religare' শব্দ থেকে উৎপন্ন, যার মানে হল পুনরায় পাঠ করা, পুনরাবৃত্তি করা (to read over again, rehearse)। এই জন্যই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি বলতে তাঁদের বোঝায়, যারা ধর্মবিশ্বাসের সাথে যুক্ত বিষয়কে অধ্যবসায় সহকারে পুনর্বিবেচনা করে। রাইস ডেভিডস (Rhys Davids) মনে করেন, 'Religion' শব্দটি যার থেকে উৎপত্তি তার অর্থ হল একটি নিয়মনিষ্ঠ, দ্বিধাগ্রস্ত, বিবেকী মনের গঠন (a law abiding, scrupulously, conscientious frame of mind)। পাশ্চাত্য দর্শনে 'Religion' বলতে বিশেষ কিছুতে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস ও আচরণ বোঝায়। এ যেন এক উচ্চতর অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস—"Belief in the existence of supernatural ruling power."

or

"Religion is recognition on the part of man of some higher unseen power or having control of his disting, and as being entitled to obidence, reverence and worship."[৫০]

যদি ইংরেজি 'Religion' শব্দটির 'Religare' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয় যার অর্থ হল বন্ধন (Bond), তাহলে বলা যায় যে, ব্যক্তির জীবনে এবং জাতির জীবনে যা যথার্থ সংহতি আনে তাই ধর্ম। 'ধৃ' ধাতুর সাথে 'মন্' প্রত্যয় করে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণা করা—"ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহুঃ।" যা বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে তাই ধর্ম—'ধর্ম বিশ্বজগতঃ প্রতিষ্ঠা।' হিন্দুধর্মে উক্ত রয়েছে—"যার দ্বারা নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম"—"যেন আত্মনঃ তথা অন্যেবাং জীবনং বর্ধনাঞ্চাপি স ধর্মঃ।"

সাধারণভাবে ধর্মদর্শন বলতে আমরা বুঝি ধর্মকে দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা বা বিচার করা। এখানে আবেগ, অনুভূতি ও বিশ্বাসের পরিবর্তে চিন্তা ও যুক্তির প্রাধান্য বেশি। অর্থাৎ ধর্মে যে সমস্ত আবেগ, অনুভূতি ও বিশ্বাসের প্রচলন রয়েছে সেগুলিকে দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে যথার্থতা নির্ণয় করা। মূলত ধর্ম সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনাকেই ধর্মদর্শন বলা হয়। তবে বিভিন্ন দার্শনিক ধর্মদর্শনকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। Fedrick Ferre বলেন, "ধর্মদর্শন একটা বিশেষ বিষয়ে আগ্রহ দেখায়, সেটা হল দর্শনের মধ্যে থেকে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে।" W.S. Brightman-এর মতে, "ধর্মদর্শন হল ধর্মের এবং ধর্মের সঙ্গে অন্যান্য অভিজ্ঞতার সম্বন্ধের বৌদ্ধিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সত্যতা এবং ধর্মীয় মনোভাব ও ক্রিয়ার মূল্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টা"। Caird বলেন, "ধর্ম এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণাকে অনুভূতি বা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিষয়বস্তু করে তোলা। পূর্ব থেকে এই বিষয়টি অনুমান করে নিয়ে কাজ করা।" Galloway এর মতে,"মানুষের জীবনের এবং প্রগতির প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে ধর্মের চরম সমস্যা নিয়ে যে দর্শন আলোচনা করে তাকে ধর্মদর্শন বলে।"

Wright বলেন, "ধর্মদর্শন ধর্মের সত্য আলোচনা করে। সামগ্রিকভাবে জগতের ব্যাখ্যায় ধর্মের ক্রিয়াকলাপ এবং বিশ্বাসের চরম তাৎপর্য নিরূপণ করা ধর্মদর্শনের কাজ। এছাড়া ধর্মের সঙ্গে তত্ত্বের সম্পর্ক নিরূপণ করাই ধর্মদর্শনের কাজ।" Miall Edwards এর মতে, "এ হল ধর্ম সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার স্বরূপ, ক্রিয়া, মূল্য, সত্যতা এবং পরম তত্ত্বের স্বরূপের প্রকাশ হিসাবে ধর্মের সামর্থ্য কতটুকু তার অনুসন্ধান।" John Hick-এর মতে, "ধর্মদর্শন হল ধর্ম সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তন, ধর্মের প্রকৃতি, কার্যাবলী, মূল্য, ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সত্যতা, পরম সত্তার স্বরূপের প্রকাশ হিসাবে ধর্মীয় অভিজ্ঞতার যথার্থতা প্রভৃতি সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধান।

ধর্মদর্শনের প্রথম প্রচেষ্টাগুলি হল ধর্মকে বোঝা, ধর্ম কি তা আবিষ্কার করা এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় ধারণাগুলির পদ্ধতিগত অর্থ উদ্‌ঘাটন করা। ধর্মীয় ধারণাগুলি সার্বিক ধারণা, তাদের যৌক্তিক তাৎপর্য আছে এবং এগুলি সত্য কি মিথ্যা এ প্রশ্ন উত্থাপন করা অযৌক্তিক নয়। ধর্মদর্শনের এই দিকটির কাজ হল ধর্মের মধ্যে যে বুদ্ধিগত সত্যতা আছে সেটির অনুসন্ধান করা। ধর্মদর্শনের লক্ষ্য সম্পর্কে থমসন বলেন, "দর্শনের লক্ষ্য হল উপলব্ধি, সত্যের আবিষ্কার এবং বিচার বুদ্ধির পরিতৃপ্তি। ধর্মদর্শনের এই লক্ষ্য ধর্মের দিকে ধাবিত।" যখন বলা হয়, ধর্মদর্শনের লক্ষ্য ধর্মের মধ্যে নিহিত সত্যগুলির বৌদ্ধিক উপলব্ধি, তার অর্থ এই নয় যে, ধর্মদর্শনের কাজ

প্রধানত ধর্মের উৎপত্তি, শ্রেণিভেদ এবং ধর্মের বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা, ধর্মদর্শন যা জানতে চায় তা হল ধর্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সত্যতা ও মিথ্যাত্বের বৌদ্ধিক ভিত্তিসমূহকে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, ধর্মদর্শন ধর্মের কোনো দিক নয়, এটি ধর্মীয় আলোচনা এবং ধর্মের দার্শনিক আলোচনা। তাই ফ্রেডরিক ফেরী যথার্থই বলেছেন, এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ধর্মদর্শন একটা বিশেষ বিষয়ে আগ্রহ দেখায় সেটা হল দর্শনের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা।

মূল্যবিদ্যা (Axiology) :

সম্প্রতিককালে এই মূল্যবিদ্যা দর্শনের একটি বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দর্শনের কাজ হল বৌদ্ধিক সমালোচনা। তাই Axiology হল দর্শনের বিবেক। মূল্যবিদ্যা ব্যবহারিক দর্শনের একটি শাখা, যা মূল্যের প্রকৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করে। মূল্যায়নের নানা ধরণ নিয়ে ব্যাখ্যা করে এই তত্ত্ব। মানুষের রুচি ও মূল্যবোধ প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। তাই মূল্যায়নের প্রকৃতিও দিনে দিনে পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের মূল্যায়ন হচ্ছে না নব নব প্রকৃতিতে। মূল্যায়ন নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে একাধিক ঘরাণার সৃষ্টি হয়েছে। কারও মূল্যায়ন বস্তুভিত্তিক আবার কারও মূল্যায়ন বিষয়ভিত্তিক বা সমাজভিত্তিক। 'Axiology' সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে— "Axiology is the philosophical study of the nature of values. Bourgeois axiology took shape at the turn of 20th century in an attempt to solve some complex question of philosophy that deals with the general 'problem of value.' Bourgeois philosophy assumes that these questions (the meaning of life and history, the object and basis of knowledge, the final aim and justification of human activity, relations between the individual and society and others) are not amenable to scientific analysis. The problem of value is thus reduced to disclosing all and sundry and to a special extra-scientific study, a peculiar from of seeing the world. Moreover values are considered extra-social phenomena."[৫১]

এই আলোচনায় বলা হচ্ছে মূল্যবিদ্যা হল মূল্য বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্ব। দর্শনের জটিল প্রশ্নের সমাধান কল্পে বুর্জোয়া মূল্যবিদ্যার বিকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীতে। জীবন; ইতিহাস, বস্তু, জ্ঞানের উৎস, মানব ক্রিয়াকলাপ, ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মূল্যবিদ্যা আলোকপাত করে। বিজ্ঞান দ্বারা এই মূল্যবিদ্যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এটি একটি সমাজাতিরিক্ত সত্তা। যুগ যুগ ধরে মানবসমাজ এগিয়ে

চলেছে; অর্থ সামাজিক কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে। তাই এই মূল্যবিদ্যার স্থায়ী কোনো চূড়ান্ত ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। যুগে যুগে দার্শনিকরা এই মূল্যবিদ্যা সম্পর্কে নব নব প্রত্যয় সৃষ্টি করেই চলেছে। মানুষের আদিম পর্যায়ে এই মূল্যবোধের তেমন কোনো বিকাশ ঘটেনি। সমাজ বিকাশের ধারা ধরেই এই মূল্যবোধের ধারণা মানবচেতনায় স্থান নিয়েছে। সার্বিক মূল্যবোধের ধারণা অবাস্তব। 'Axiology'-র সংজ্ঞা প্রদানে আরও বলা হয়েছে—"যে বিদ্যা বা বিজ্ঞানের মান বা মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাই মূল্যবিদ্যা। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল এই তিনটি হল প্রধান মূল্য।"[৫২]

সৌন্দর্যবিদ্যা (Aesthetics) :

সৌন্দর্যবিদ্যা হল দর্শনের অন্যতম শাখা মূল্যবিদ্যার অন্তর্গত। দর্শনের যে শাখা সুন্দরের আদর্শ, স্বরূপ ও শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলে সৌন্দর্যবিদ্যা (Aesthetics)। সৌন্দর্যবিদ্যা হল একটি আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান (Normative science)।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে দার্শনিকদের বিশেষ করে গ্রীক দার্শনিকদের মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের মত অনুযায়ী সৌন্দর্য হল বস্তুর অপরিহার্য গুণ। সৌন্দর্যই বস্তুর অবিনশ্বর সত্তা। জগতের সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তু ও তার সৌন্দর্যের পিছনে রয়েছে একটি অখন্ড ও চিরন্তন (Absolute) সৌন্দর্য। দার্শনিক প্লেটো (Plato) এই চিরন্তন সৌন্দর্যকেই জগতের অন্তর্নিহিত চিরস্থায়ী অনন্ত সত্তারূপে আখ্যাত করেছেন। সকল সৌন্দর্যই এই চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতিফলন। প্লেটোর ভাষায়— "Beauty-a nature which in the first place is everlasting, not growing and decaying or waxing and waning,....but absolute, separate, simple and ever-lasting, which without diminution and without increase, or any change, is imparted to the ever-growing and perishing beauties of all other thing."[৫৩]

অ্যারিস্টটলের মতে, সৌন্দর্যের প্রধান উপাদানগত দিক হল প্রকৃতিগত শৃঙ্খলা, সমতা ও সুনির্দিষ্টতা। অ্যারিস্টটল 'Poetics' এ বলেছেন যে, সৌন্দর্য আকার ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বিন্যস্ত হয়। একটি জীবন প্রণালীর সৌন্দর্য বিচার করতে গেলে তার অঙ্গ সৌন্দর্যের শৃঙ্খলা ও সমতার দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। তিনি বলেছেন যা সুন্দর তা ভাবগ্রাহী, রুচিসম্মত। মনোরম ভাব অনুভূতিকে নাড়া দেয় ও সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে তোলে। অবশ্য সব মনোরম অনুভূতিই সৌন্দর্যসিদ্ধ নয়, কেননা যা মনোরম তা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। কিন্তু যা প্রকৃত সুন্দর তা শাশ্বত। পুষ্পের রূপ, গাঠনিক শোভা, চাঁদের আলোর কণা, আকাশের তারার দ্যুতি অমর সৌন্দর্যের রূপক। মহান

সৌন্দর্যের মধ্যে শুভত্ব অন্তর্লীন (The beautiful is that good which is pleasant because it is good)। অ্যারিস্টটলের মতে, শিল্পসৌন্দর্য সুষমামন্ডিত প্রকৃতির প্রতিবিম্ব। শিল্প সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে যে কাল্পনিক জগৎকে আমরা অন্তঃপ্রত্যক্ষ করি, তা বাস্তব জগতেরই প্রতিচ্ছায়া। শিল্পী বিশ্বচরাচরের সার্বজনীন সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করে, নতুন পেয়ালায় সেই রথের পানপাত্র সাজান। আবার শিল্পীর মনোগতভাবের উপাদান গুণে শিল্পের রূপরেখা হয় প্রমূর্ত ও সার্থক। ভাস্কর্য হয়ে পড়ে অন্তর্লীন সঙ্গীত (Architecture is frozen music)। আনন্দ, বেদনা বা কোনো স্তব্ধ করুণ মৌনভাব শিল্পের সমগ্রতাকে দেয় গভীর পূর্ণতা। সেখানে দর্শন হয়ে পড়ে শিল্প, সৌন্দর্য হয় সাধনা। বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি মিলেমিশে গড়ে তোলে সাধনার মন্দির। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিল্পবোধ ও সৃষ্টিসৌন্দর্য উভয়ই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপেরই প্রতিকৃতি। কবি কীটস (Keats)-এর মতে, "Beauty is truth, truth is beauty" অর্থাৎ সৌন্দর্য সত্য, সত্যই সৌন্দর্য।

তথ্য নির্দেশ :

১. SIMON BLACKBURN : Oxford DICTIONARY OF PHILOSOPHY, OXFORD, NEWYORK, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1996, P. 286
২. Phanibhushan Chatterji : OUTLINES OF GENERAL PHILOSOPHY, Srigouranga Press, Calcutta, TENTH EDITION, 1951, P. 12
৩. IBID, P.10
৪. IBID, P 10-11.
৫. IBID, P.11
৬. IBID, P.11
৭. IBID, P.13
৮. IBID, P.12
৯. IBID, P.13
১০. IBID, P.11
১১. মোঃ ইয়াসিন আলী, দর্শনের স্বরূপ সন্ধান, গতিধারা, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০১৫, পৃ.২২।
১২. Russell, The Problems of Philosophy,
১৩. Phanibhushan Chatterji : Outlines of General Philosophy, Srigouranga Press, Calcutta, TENTH EDITION, 1951, P.12
১৪. শ্যামলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শনের গোড়ার কথা, রামকৃষ্ণ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ৮
১৫. ড. রশীদুল আলম, দর্শনের ভূমিকা, মেরিটফেয়ার, ঢাকা, জুন ২০০৮, পৃ. ২৭

১৬. অমরেন্দ্র বসু, দর্শন প্রসঙ্গ, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৯, পৃ. ১৭
১৭. ড. বিমলেন্দু সামন্ত, দর্শন মালা, আরামবাগ বুক হাউস, কলকাতা, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ৩০
১৮. তদেব, পৃ. ১৬
১৯. শ্যামলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শনের গোড়ার কথা, রামকৃষ্ণ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ৫
২০. তদেব পৃ. ৪
২১. Introduction of philosophy, p. 5
২২. Unher. org
২৩. Cunningham, problems of philosophy ISBN-8171171869
২৪. PHANIBHUSHAN CHATTERJI : OUTLINES OF GENERAL PHILOSOPHY, Srigouranga Press, Calcutta. TENTH EDITION, 1951, P. 10-11
২৫. Hegel. Quoted in wayper. p. 153-154
২৬. J. Leowenberg, Hegel, Selections, in John H. Hallowell, Main currents in Modern Political thought, p. 257
২৭. তরুণ কুমার সাঁতরা, পাশ্চাত্য দর্শন, অভিনব প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৮
২৮. PHINIBHUSHAN CHATTERJI : OUTLINES OF GENERAL PHILOSOPHY, Srigouranga Press, Calcutta, TENTH EDITION, 1951, P.12
২৯. Weber, History of philosophy, p. 22
৩০. শ্যামলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শনের গোড়ার কথা, রামকৃষ্ণ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৯
৩১. শ্রী হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শন দীপিকা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৪
৩২. Caird, philosophy of religion, p. 3
৩৩. G. vesey and P. Foulkes ; COLLINS DICTIONARY OF PHILOSOPHY, COLLINS, London and Glasgow, First published, 1990, p. 192
৩৪. Aristatle, Metaphysics, warrington.
৩৫. The cembridge Dictionary of philosophy, p. 43
৩৬. Ibid, p. 42
৩৭. Concise ROUTLEDGE ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, London and New York, First Published, 2000. p. 246
৩৮. Editorial consullant Antony Flew : A Dictionary of Philosophy, Pan Books ltd, London, third Edition, 1984, p. 109

৩৯. Mackenzie, A Martual of Ethics.
৪০. W. Lillie, An Introduction to Ethics, p. 2
৪১. Ibid, p. 1
৪২. J.S Mackenzie, A manual of ethics, p. 2
৪৩. Copi, Symbolic Logic, p.1
৪৪. Copi, Introduction to Logic, p. 2
৪৫. SIMON BLACKBURN : Oxford DICTIONARY OF PHILOSOPHY, Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 221
৪৬. JAGADISWAR SANYAAL, GUIDE TO SOCIAL PHILOSOPHY, SRIBHUMI PUBLISHING COMPANY, KOLKATA, P. 3
৪৭. Gisbert, Fundamental of Sociology, p. 26
৪৮. অনাদি কুমার মহাপাত্র, সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রদর্শন পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৫
৪৯. তদেব, পৃ. ৮
৫০. Oxford Dictionary.
৫১. Edited by I. Frolov, Dictionary of Philosophy Moscow, 2nd revised edition, 1984, p. 34
৫২. সাইয়েদ আব্দুল হাই, দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৮, পৃ. ৮৪-৮৫
৫৩. Plato, The Symposium.